সংক্ষিপ্ত

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

সাইয়্যেদ মাহমূদ শুকরী আলূসী

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদনা :

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

تهذيب مسائل الجاهلية

« باللغة البنغالية »

السيد محمود شكري الآلوسي

ترجمة: محمد أسد الله الغالب

مراجعة: عبد الله شهيد عبد الرحمن

د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1435

IslamHouse.com

সূচীপত্র

১২। সত্যপন্থীদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা

১৩। হক পন্থীরা দুর্বল এই অহংকারে হকের সাহায্য থেকে দুরে থাকা

১৪। নিজেদের অধিকতর যোগ্য ভেবে অন্যের গৃহিত সত্যকে বাতিল গণ্য করা

১৫। সঠিক ও ত্রুটিপূর্ণ কিয়াস সম্পর্কে অজ্ঞতা

১৬। সৎ লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা

১৭। না বুঝার অজুহাত

১৮। দলীয় নীতির বিরোধী হওয়ায় সত্যকে অস্বীকার করা

১৯। যাদুর অলৌকিক ক্রিয়া কান্ডকে অভ্রান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ করা

২০। বংশ সম্বন্ধ পরিবর্তন করা

২১। আল্লাহর কালামের মুল বক্তব্য হেরফের করা

২২। দ্বীনি কিতাবসমূহে তাহরীফ-বিকৃতিসাধন

২৩। দ্বীনের হেদায়েত ছেড়ে দ্বীন বিরোধী পথের অনুগমন

২৪। অন্যের অনুসৃত সত্যকে অস্বীকার

২৫। প্রত্যেক দলের এ দাবী করা যে, সত্য কেবল তাদের মাঝেই নিহিত

২৬। দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে গৃহিত হওয়া সত্বেও কোনো বস্তুকে অস্বীকার করা

২৭। নগ্নতার প্রদর্শনী

২৮। হালাল বস্তুকে হারাম করে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া

২৯। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিকৃত করা

৩০। আল্লাহর প্রতি বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি আরোপ করা

৩১। স্রষ্টা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হতে সৃষ্টজীবের বিরত থাকা

৩২। নাস্তিক্যবাদ

৩৩। আল্লাহর মালিকানায় শরীক করা

৩৪। সমস্ত নবুওয়তকে অস্বীকার করা

৩৫। তাক্বদীরকে অস্বীকার করা

৩৬। যমানাকে গালি দেয়া

৩৭। আল্লাহর নেআমতসমূহকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা

৩৮। আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা

৩৯। বাতিল বই-পত্র পড়াশুনা করা

৪০। আল্লাহর পরিকল্পনাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা

৪১। ফেরেশেতা ও রাসূলগণকে অস্বীকার করা ও তাদের মধ্যে পার্থক্য করা

৪২। নবী ও রাসূলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা

৪৩। না জেনে ঝগড়া করা

৪৪। দ্বীনের ব্যাপারে না জেনেশুনে কথা বলা

৪৫। কেয়ামতকে অস্বীকার করা

৪৬। আল্লাহ বিচার দিবসের মালিক এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা

৪৭। কেয়ামতের দিন কোনরূপ বন্ধুত্ব ও শুপারিশ কাজে লাগবে না- এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা

৪৮। শাফাআতের ভুল অর্থ গ্রহণ করা

৪৯। আল্লাহর অলীদের হত্যা করা

৫০। জিবত ও তাগুতের উপর ঈমান রাখা

৫১। সত্যের উপর মিথ্যার আবরণ দেওয়া

৫২। সত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য সাময়িকভাবে তাকে স্বীকার করে নেওয়া

৫৩। নবীদের রবের আসন দেওয়া

৫৪। আল্লাহর কিতাবের শব্দসমূহকে স্থানচ্যুত করা

৫৫। হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের অভিনব উপাধিসমূহ দ্বারা অভিহিত করা

৫৬। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা

৫৭। মুমিনদের প্রতি মিথ্যারোপ

৫৮। মুমনিদের বিরুদ্ধে সমাজে ফাসাদ সৃষ্টির অভিযোগ

৫৯। মুমনিদের বিরুদ্ধে ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ

৬০। হকপন্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট কুপরামর্শ

৬১। সত্য বিচ্যুতির ফলে দলে দলে বিভক্তি

৬২। নিজেদের লালিত মতবাদকেই হক মনে করে তার উপরে আমল বজায় রাখার দাবী

৬৩। ইবাদতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা

৬৪। ইবাদতে কমতি করা

৬৫। ইবাদতের উদ্দেশ্যে রুচিকর খাদ্য ও সৌন্দর্য ত্যাগ করা

৬৬। মুখে শিস দেওয়া ও হাত তালি দেওয়ার মাধ্যমে ইবাদত করা

৬৭। আকীদা-বিশ্বাসে মুনাফেকী

৬৮। ভ্রষ্টতার দিকে আহবান

৬৯। জেনেশুনে কুফরীর দিকে আহবান

৭০। বড় ধরণের মকরবাজি

৭১। আলেমদের অবস্থা

৭২। নিজেদেরকেই কেবল আল্লাহর অলী ধারণা করা

৭৩। শরীয়ত ত্যাগ করে আল্লাহর মহববত দাবী করা

৭৪। আল্লাহর উপরে কাল্পনিক মিথ্যা আশা

৭৫। নেককার লোকদের কবরগুলিকে মসজিদে পরিণত করা

৭৬। নবীদের স্মৃতিচিহ্নসমূহে মসজিদ নির্মাণ করা

৭৭। কবরে বাতি দেওয়া

৭৮। কবরগুলিকে ঈদের স্থানে পরিণত করা

৭৯। কবরে জবেহ করা

৮০। বড় বড় নির্দশনসমূহ দ্বারা বরকত কামনা করা

৮১। প্রতিপত্তির অহংকার

৮২। বিভিন্ন গ্রহের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা

৮৩। বংশ উল্লেখ করে তিরস্কার করা

৮৪। কারো মৃত্যুর পর চিৎকার করে কান্নাকাটি করা

৮৫। বাপ-মায়ের কর্ম দ্বারা কাউকে তিরস্কার করা

৮৬। কোনো বিশেষ ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার গর্ব করা

৮৭। নবী বংশের লোক হওয়ার গর্ব

৮৮। পেশার অহংকার

৮৯। ধন সম্পদের অহংকার

৯০। দরিদ্রদের ঘৃণা করা

৯১। ফেরেশতা অহী, রেসালাত ও কেয়ামতকে অস্বীকার করা

৯২। জিবত ও তাগুতের উপর ঈমান

৯৩। জানা সত্বেও সত্য গোপন

৯৪। না জেনে শুনে আল্লাহর সম্পর্কে কথা বলা

৯৫। স্ববিরোধিতা

৯৬। পাখী উড়িয়ে ভালমন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

৯৭। আঁক-জোক করে ভবিষ্যত বের করার দাবি করা।

৯৮। কোনো কিছুকে অশুভ ধারণা করা

৯৯। ভবিষ্যদ্বাণী করা

১০০। তাগুতের নিকট বিচার পেশ করা

গ্রন্থকারের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগের আরবদের এবং আহলে কিতাব ইয়াহূদী নাছারাদের বিরোধিতা করেছিলেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রত্যেক মুসলিমের জেনে রাখা অবশ্য প্রয়োজন। কেননা, বিপরীত বস্তু সম্পর্কে জানা থাকলেই কেবল আসল বস্তু চেনা সম্ভব হয়। তবে এখানে সর্বাপেক্ষা ভয়ের ব্যাপার যেটি, সেটি হলো সরাসরি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দ্বীন সম্পর্কেই ঈমান না রাখা। আর ঐ সংগে যদি কেউ জাহেলিয়াতের দ্বীনকেই ভালবাসে এবং তার উপরেই ঈমান আনে, তাহলে তো ক্ষতির আর শেষ থাকে না। (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন)। যেমন আল্লাহ স্বীয় পাক কালামে ইরশাদ করেন-

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾ [الزمر: ٦٣]

‘যারা বাতিলের উপর ঈমান আনলো এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করলো, তারাই সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সূরা আনকাবুত : ২৯ : আয়াত ৫২)

১। নেককারদের দু‘আ

জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা আল্লাহর নিকট দু‘আ এবং ইবাদত করার সময় নেককার লোকদের শরীক করতো। তারা একে নেককার লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মনে করতো এবং এর দ্বারা তারা আল্লাহর নিকট তাদের শাফাআত বা সুপারিশ কামনা করতো।

আল্লাহ সূরা যুমারের প্রথম দিকে ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ سورة الزمر: ٣﴿

‘যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অলী-বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তারা বলে আমরা ওদের ইবাদত করি কেবলমাত্র এই জন্য যে, ওরা

আমাদেরকে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে।' (সূরা যুমার, ৩৯ : আয়াত-৩)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .﴿سورة يونس : ١٨﴾

'ওরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করে, যারা তাদের না কোনো ক্ষতি করতে পারে, না কোনো উপকার করতে পারে এবং ওরা বলে এরাই আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআতকারী।' (সূরা য়ূনুস, ১০ : আয়াত ১৮)

ঐটি ছিল সব চেয়ে বড় বিষয় যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের বিরোধিতা করেছিলেন। অতঃপর তিনি ইখলাছ নিয়ে এলেন এবং লোকদের বলে দিলেন যে, এটা আল্লাহর দ্বীন এখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করা হবে না। যেসব লোকেরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে চায়, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

এই উপরোক্তটিই হলো প্রকৃত দ্বীন। এরই কারণে মানব জাতি ‘মুসলিম’ ও ‘কাফির’ দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই বিষয়টিকেই শত্রুতার মানদণ্ড ধরা হয়েছে এবং এরই কারণে জিহাদ আইন সংগত করা হয়েছে।

আল্লাহর ইরশাদ করেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. ﴿سورة البقرة : ١٩٣﴾

‘তোমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা বাকী থাকে এবং দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য খালেছ হয়ে যায়।’ (সূরা বাক্বারাহ ২ : আয়াত ১৯৩)

২। অনৈক্য

জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা ছিল একেবারেই বিশৃঙ্খল। নেতারা আনুগত্য করাকে তারা মানহানিকর ও গ্লানিকর বলে মনে করতো। আল্লাহ তাদেরকে জামাআতবদ্ধ হওয়ার আদেশ দিলেন এবং বিভক্ত হতে নিষেধ করলেন।

যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿سورة آل عمران : ١٠٣﴾

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো। খবরদার বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা স্মরণ করো সেই অতীতকে যখন তোমরা আপোষে পরস্পরের শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে পারস্পরিক মহববত পয়দা করে দিলেন। ফলে তোমরা সকলেই আল্লাহর রহমতে পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে। (আরও স্মরণ করো) যখন তোমরা (পারস্পরিক শত্রুতার কারণে ধ্বংসের) অগ্নিকুন্ডের কিনারে পৌঁছে গিয়েছিলে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেন। এই ভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সত্য-সঠিক পথ পেতে পারো।' (সূরা আল ইমরান, ৩ : আয়াত ১০৩)

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যকার যুদ্ধের দিকে ইশারা দিয়েছেন, যা দীর্ঘ একশত বিশ বৎসর যাবৎ চলেছিল। যতক্ষণ না ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেন এবং হিংসা দূরীভূত হয়ে যায়। ইবনে ইসহাক একথা বলেছেন। তাদের মধ্যে সর্বশেষ যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটি ছিল 'বুআছের' যুদ্ধ। এ বিষয়ে 'কামেল' নামক কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াতে আরবের মুশরিকদের মধ্যে যে দীর্ঘায়িত বিবাদ- বিসম্বাদ যেমন বসুসের যুদ্ধ (যা চল্লিশ বৎসর যাবত চলেছিল) প্রভৃতি জারি ছিল- সেই দিকে ইশারা করা হয়েছে। হাসান রা. থেকে একথা বর্ণনা করা হয়েছে।

এমনিভাবে নেতার অনুগত হয়ে জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا . ﴿سورة التغابن : ١٦﴾

‘তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো এবং নির্দেশ গ্রহণ করো ও অনুগত হয়ে চলো’। (সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : আয়াত : ১৬)

এমনি ধরণের আরও বহু আয়াত রয়েছে, যেখানে একনায়কত্ব, হঠকারিতা, বিশৃঙ্খলা, আনুগত্যহীনতা প্রর্ভতি জাহেলী যুগের স্বভাবসমূহের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৩। শাসকের বিরোধিতা

জাহেলী যুগের আরবরা শাসন কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে ফযীলতের কাজ এমনকি কেউ কেউ একে ধর্ম বলে মনে করতো। আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই বদ-স্বভাবের বিরোধিতা করলেন এবং তাদেরকে শাসনকর্তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সহ্য করার নির্দেশ দিলেন। তিনি লোকদেরকে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ গ্রহণ, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং উহাদের উপদেশ প্রদানের পরামর্শ দিলেন ও সকলকে এ বিষয়ে বারবার তাকিদ করলেন। যেমন

উপরোক্ত তিনটি ব্যাপারে ছহীহ্ হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর তিনটি ব্যাপারে খুশী হন : (১) তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই আনুগত্য করো এবং তাঁর সংগে কাউকে শরীক করো না। (২) তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং (৩) আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের উপর শাসন ক্ষমতা দান করেন, তাদেরকে সৎ পরামর্শ দান করো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. (رواه البخاري)

'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার আমীরের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে সে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি তার শাসনকর্তার আনুগত্য হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো।' (বুখারী)

অন্য হাদীসে উবাদা ইবন ছামেত রা. বলেন যে : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা

তাঁর নিকট বায়‘আত করলাম। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বিষয় ছিল। যেমন- নেতার নির্দেশ শ্রবন করা, সম্পদে-বিপদে, কষ্টে-স্বাচ্ছন্দে সকল অবস্থায় তাঁর আনুগত্য করা এবং শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত না হওয়া। তবে হ্যাঁ, যদি নেতা প্রকাশ্যে কুফরী করেন, তাহলে তাঁর আনুগত্য করা চলবে না।

এই বিষয়ে বহু ছহীহ্ হাদীস রয়েছে। বলাবাহুল্য রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত নির্দেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের কারণেই আজ মানুষের দ্বীন- দুনিয়া সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি- বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

৪। তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ

জাহেলী আরবদের দ্বীন যে কয়টি মুল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে সেরা ছিল তাকলীদ। ইহা মানব সৃষ্টির সেই আদিযুগ থেকে এ যাবৎ সকল কাফির, মুশরিকদের লালিত শ্রেষ্ঠ মূলনীতি।

আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন-

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ (سورة الزخرف : ٢٣-٢٤)

'এমনিভাবে তোমার পূর্বে আমি যেখানেই কোনো ভয় প্রদর্শনকারী নবী পাঠিয়েছি সেখানকার বড়লোক বা মাতবর শ্রেণীর লোকেরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ- দাদাদেরকে একই দলভূক্ত পেয়েছি। অতএব আমরা তাদেরই পথ-পন্থা অনুসরণ করবো। এর জওয়াবে নবীগণ যখন বলতেন, আমরা কি তোমাদের নিকট তোমাদের বাপ-দাদাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ হিদায়েত নিয়ে আসিনি? তখন তারা সরাসরি বলে দিতো- যাও, তোমরা যা কিছু হিদায়েত নিয়ে প্রেরিত হয়েছ সবকিছুকে আমরা অস্বীকার করি'। (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: আয়াত ২৩ ও ২৪)

কাফিরদের উপরোক্ত কথার জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন-

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿سورة الأعراف : ٣﴾

‘তোমাদের রবের কাছ থেকে যা কিছু পাঠানো হয়েছে, তোমরা কেবল তারই অনুসরণ করো। তাকে ছেড়ে অন্য কোনো আউলিয়া বা বন্ধুদের অনুসরণ করো না। বস্তুতঃপক্ষে এটাই সত্য যে, তোমরা খুব কম লোকেই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।’ (সূরা আল-আ‘আরাফ ৭: আয়াত ৩)

এমনিভাবে সূরা বাক্বারাহ্ ১৭০ আয়াত ছাড়াও বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জাহেলী যুগের লোকেরা তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণের গন্ডিতে বাঁধা ছিল। তারা দ্বীনের ব্যাপারে যাবতীয় চিন্তা-গবেষণা থেকে দূরে থাকতো। আর এ জন্যেই তো তারা জাহেলিয়াতের অন্ধ গলিতে যুগ যুগ ধরে ভ্রান্ত পথিকের মত ঘুরে বেরিয়েছে। একই অবস্থা প্রত্যেক যুগের ঐসব লোকদের জন্য, যারা জাহেলী যুগের লালিত উপরোক্ত তাকলীদী বন্ধনে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছেন এবং বাপ-দাদার প্রচলিত রেওয়াজের অন্ধ অনুসারী মুকাল্লিদ হয়ে যাবতীয় স্বাধীন চিন্তার দুয়ার ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের জন্য বন্ধ রেখেছেন।

৫। ফাসেক আলেম এবং মূর্খ আবেদগণের অনুসরণ

তাদের আর একটি বদ অভ্যাস ছিল বে-আমল ফাসেক আলেম এবং মুর্খ আবেদগণের বাহ্যিক বেশভূষা ও চালচলন দেখে তাদেরকে বিরাট কিছু মনে করা ও তাদের অনুসরণ করা।

আল্লহা তা'আলা এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . ﴿سورة التوبة : ٣٤﴾

'হে ঈমানদারগণ! (সাবধান) ইয়াহূদী-খ্রীষ্টানদের পাদ্রী-পুরোহিতরা অসাধু পন্থায় মানুষের সম্পদ খেতো এবং আল্লাহর পথ থেকে তাদের বিরত রাখতো।'[১] (সূরা আত-তাওবা, ৯ : আয়াত ৩৪)

সূরা মায়েদার ৭৭ আয়াত ছাড়াও এমনি ধরণের বহু আয়াত রযেছে যেখানে ঐসব ভন্ড তপস্বীদের অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে যা প্রকাশ্যভাবে জাহেলী যুগের তরীকা।

---

[1] বর্তমান যুগের ধর্ম ব্যবসায়ী পীর ফকির ও তাদের অন্ধ অনুসারী ভক্ত মুরীদগণ আয়াতটি অনুধাবন করুন।

৬। বাপ-দাদার দোহাই

সঠিক কোনো যুক্তি ছাড়াই বিগত যুগের লোকদের দোহাই দিয়ে কাজ করা জাহেলী যুগের লোকদের অন্যতম স্বভাব ছিল। আল্লাহ তা'আলা এই স্বভাবের তীব্র ভৎর্সনা করেছেন। যেমন-

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ (سورة القصص : ٣٦-٣٧)

'মুসা আলাইহিস সালাম স্পষ্ট দলীল ও আয়াতসমূহ নিয়ে যখন তাঁর (বিরোধী পক্ষের) লোকদের কাছে গেলেন, তখন তারা বলল- ঐটা তো যাদু ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের কাছে শুনিনি। মূসা আলাইহিস সালাম তখন তাদের জওয়াবে বলেছিলেন : আমার রব ভালভাবেই জানেন, কে তাঁর কাছ থেকে সত্যিকারের হিদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কার জন্য শুভ পরিণাম অপেক্ষা করছে। নিশ্চয়ই যালিমরা কখনোই কামিয়াব হতে পারে না'। (সূরা আল-কাসাস ২৮ : আয়াত ৩৬ ও ৩৭)

অন্যত্র আল্লাহ নবী নূহের আলাইহিস সালাম এর কওমের বর্ণনা দিয়ে বলেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ . (سورة المؤمنون : ٢٣ -٢٤)

'আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? উত্তরে তাঁর সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী লোকেরা বলল, এ ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চাচ্ছে। আল্লাহ চাইলে একজন ফেরেশতাকে এ কাজে পাঠাতে পারতেন। এ ব্যক্তির এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের নিকট শুনি নাই।' (সূরা আল-মুমিনুন, ২৩ : আয়াত ২৩-২৪)

এমনিভাবে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামকেও শুনানো হয়েছে, যা কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে।

নবীদের দাওয়াতকে অস্বীকার করার মূলে সকল যুগের সকল কাফিরগণের একই যুক্তি ছিল যে, তাদের বাপ-দাদাগণ এই নিয়মের অনুসারী ছিল না এবং তারা এসব কথা আগ থেকে কখনো জানতো না। তাদের এই বদ স্বভাব ও অনঢ় মনোভাব লক্ষত করার মত। যদি তাদের চোখ, কান ও হৃদয় খোলা থাকতো তাহলে তারা অবশ্যই সত্যকে দলীল সহকারে উপলব্ধি করতো এবং সত্যের সম্মুখে বিনা বাক্য ব্যয়ে মাথা নত করতো।

এই অবস্থা তাদের উত্তরসূরী (বর্তমান যুগের) লোকদের- যারা অন্তরের দিক দিয়ে পূর্বের লোকদের সদৃশ।

৭। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই

হক ও বাতিলের পরিচয় নির্ধারণের জন্য তারা সংখ্যার উপর নির্ভর করতো। কোনো একটি বিষয়ের অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হলে তারা তাকেই হক বা ন্যায় বলে ধরে নিত এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের যুক্তি যতই মজবুত হোক, তারা তাকে বাতিল বলে গণ্য করতো।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জাহেলী যুগের এই কদর্য্য রীতির কঠোর প্রতিবাদ করে ইরশাদ করেন-

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ (سورة الأنعام : ١١٦-١١٧)

(হে নবী!) যদি আপনি অধিকাংশ লোকের কথা শুনে কাজ করেন তবে ওরা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে। কেননা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণার অনুসরণ করে এবং আন্দাজে কথা বলে। নিশ্চয়ই আপনার রব সবচাইতে বেশী জানেন কারা আল্লাহর রাস্তা হতে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং কারা সত্যিকারের হিদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে' (সূরা আল-আনআম, ৬ : আয়াত ১১৬-১১৭)

অতএব, বাতিলের অনুসারী লোকদের সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন, কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ উহার অনুসরণ করতে পারে না। কেননা সত্যই একমাত্র অনুসরণযোগ্য, উহার অনুসারীদের সংখ্যা যতই কম হোক না কেন। সূরায়ে সাদ এর ২৪ আয়াতেও এ বিষয়ে বলা হয়েছেঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

"শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, তবে যারা মুমিন ও সৎকর্ম করে তারা নয় এবং তারা সংখ্যায় সল্প।"

কবির ভাষায়-

تعيّرنا إنا قليل عديدنا * فقلت لها إن الكرام قليـــل.

'সংখ্যায় কম হওয়ায় কারণে লোকেরা আমাদেরকে কটাক্ষ করে। কিন্তু আমি তাদেরকে বলি, নিশ্চয়ই সত্যসেবী সম্মানিত লোকদের সংখ্যা চিরদিন কমই হয়ে থাকে।'

মোটকথা জ্ঞানী মাত্রই স্পষ্ট দলীলের সন্ধান করবে এবং দলীল দ্বারা যা প্রমাণিত হবে, কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করবে- যদিও উহার অনুসারী সংখ্যা কম হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দলীলের সন্ধান না নিয়ে কেবল অধিক লোকের ভীর দেখে সেটাই গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি মহা ভ্রান্তিতে লিপ্ত এবং জাহেলিয়াতের অনুসারী বলে গণ্য হবে।

৮। সংখ্যালঘিষ্ঠতার দোহাই

কোন বস্তুকে বাতিল ঘোষণা করার জন্যে উহার অনুসারীদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতাকে জাহেলী যুগের লোকেরা যুক্তি হিসাবে দাঁড় করাতো। উহার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন-

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴿سورة هود : ١١٦﴾

'তোমাদের পূর্বেকার জ্ঞানী লোকেরা বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি রোধের চেষ্টা কেন করেনি? তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে মাত্র কিছুসংখ্যক লোক (চেষ্টা করেছিল) যাদেরকে আমি নাজাত দিয়েছিলাম'।[২] (সূরা হুদ, ১১ : আয়াত ১১৬)

৯। শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ধোকা

সমাজে যে সব লোক জ্ঞান, প্রযুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কিংবা নেতৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপ্রত্তির মালিক ছিল, জাহেলী যুগের লোকেরা

[2] এখানে আল্লাহ্ বেশীসংখ্যক লোকদের চেয়ে অল্পসংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে হক পন্থী হওয়ার কারণে নাজাত দানের কথা ঘোষণা করেছেন। (অনুবাদক)।

তাদেরকে ভাবতো যে, এরা কখনোই ভ্রান্ত পথের পথিক হতে পারে না।

আল্লাহ রাববুল আলামীন তাদের এই ভুল ধারণা নিরসনে আদ জাতির ধ্বংস হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন-

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ (سورة الأحقاف : ٢٤-٢٦)

‘যখন তারা আগত মেঘমালাকে তাদের জমি-জায়গার অতি নিকট দেখতে পেলো, তখন তারা বললো (ভয়ের কিছু নেই) এ মেঘ আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষনের জন্য আসছে। আসলে এটিই ছিল তাদের জন্য মর্মান্তিক আযাব, যা আল্লাহর হুকুমে তাদের সব কিছুকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সকাল বেলা তাদের বিরান ঘর-বাড়ীগুলি ব্যতীত সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না। আমরা

এমনিবাবেই পাপিষ্ঠ জাতিকে তাদের উপযুক্ত বদলা দিয়ে থাকি। অবশ্যই আমি তাদেরকে দুনিয়ায় প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি এবং তাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় দিয়েছিলাম, কিন্তু এইসব তাদের কোনো কাজে আসেনি। তারা আল্লাহর স্পষ্ট আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে বসলো। ফলে আযাব আসার ব্যাপারে তারা যে টিটকারী করতো, অবশেষে তাই-ই তাদেরকে ঘিরে ধরলো’। (সূরা আল-আহকাফ, ৪৬ : আয়াত ২৪-২৬)

আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসার দেরী দেখে ঐসব প্রবৃত্তি পূজারীগণ অবিশ্বাস করে তৎকালীন নবীকে ঠাট্টাচ্ছলে বলতো-

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿سورة الأحقاف : ٢٢﴾

‘তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে নিয়ে এসো দেখি সেই গযব, যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখিয়ে থাকো’ (সূরা আহকাফ, ৪৬ : আয়াত ২২)

উক্ত আয়াত দ্বারা ঐসকল লোকদের যুক্তি বাতিল করা হলো, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী ব্যক্তিগণকে নিজেদের

যুক্তির পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে এবং ধারণা করে থাকে যে, ঐসকল ব্যক্তির অতুল্য ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সামাজিক মর্যাদা, জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্য তাদেরকে যাবতীয় প্রকারের পদস্খলন ও বিভ্রান্তি হতে বিরত রাখে।

তুমি কি দেখ না ‘আদ জাতির অবস্থা? পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তারা অর্থে- সম্পদে, শক্তি-সামর্থ্যে, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে সর্বদিক দিয়ে ইসলাম গ্রহণকারী আরব জাতির চাইতে উন্নত ছিল। অথচ তারা সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল।

অতএব বুঝা গেল যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার তাওফিক এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন ও সত্যের পথে অনুগমণ কেবলমাত্র আল্লাহর ফযল ও করম বা অনুগ্রহেই সম্ভব হয়ে থাকে। উহার জন্য অধিক মাল-সম্পদ বা স্বচ্ছল অবস্থা হওয়া শর্ত নহে। অতএব যে ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং উন্নত অবস্থা সম্পন্নদেরকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করলো সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের পথ অবলম্বন করলো এবং সঠিক পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। উপরোক্ত আদ জাতির মত ইয়াহূদী জাতিও নিজেদের হঠকারিতার

জন্য হক রাস্তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, যার বর্ণনা পবিত্র কালাম পাকের সূরায়ে বাক্বারাহ্ ৮৯ আয়াতে বিবৃত হয়েছে এই মর্মে যে, শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমণের পূর্বে ইয়াহূদীরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে শেষ নবীর আগমনের মাধ্যমে বিজয়ের আশা পোষণ করতো এবং প্রার্থনা করতো এই বলে যে, হে আমাদের প্রভু, তুমি তোমার ওয়াদাকৃত শেষ নবীকে সত্বর পাঠাও, যাতে আমরা তাঁর মাধ্যমে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারে এই যে, যখন শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসলো এই হিংসার ফলে যে, শেষ নবী আরবদের মধ্যে থেকে আগমন করেছেন। তারা তাদের ধারণায় নিজেদেরকে আরবদের চাইতে অনেক উন্নত অবস্থার অধিকারী বলে মনে করতো। অথচ তারা একথা জানেনা যে, নবুওত এবং উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কেবলমাত্র আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহেই সম্ভব হয়ে থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করে থাকেন। (একই ধরণের বর্ণনা রয়েছে' সূরা বাক্বারাহ, ১৪৬-১৪৭ আয়াতে এবং সূরা আন'আমের, ১৯-২০ আয়াতে)

১০। ঐশ্বর্যের ধোকা

জাহেলী আরবের ধনশালী ব্যাক্তিরা অফুরন্ত ধন-ঐশ্বর্যের মালিক হওয়ার কারণে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বলে মনে করতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ (سورة السبأ: ٣٤-٣٦)

“যখনই আমি কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছেঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলতোঃ আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদের কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না। বলঃ আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা রিযক বর্ধিত করেন অথবা এটা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানে না।” সূরা আস-সাবা ৩৬, আয়াত : ৩৪-৩৬)

যেমন কারুনকে বলেন-

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾. (سورة القصص: ٧٦-٧٨)

‘যখন তার কওম বলল যে, বেশী ফুর্তি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফুর্তিবাজদেরকে ভালবাসেন না। তোমাকে আল্লাহ যে অগাধ ধন-সম্পদ দান করেছেন এ দিয়ে তুমি আখেরাতের পাথের সঞ্চয় করো। অবশ্য এ জন্য দুনিয়ায় তোমার প্রাপ্য হিস্যা ভুলে যেও না এবং তুমি ইহসান করো যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি ইহসান করেছেন। আর দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না। কিন্তু কারুন জওয়াবে বলেছিল- এ সমস্ত ধন-সম্পদ তো আমি আমার নিজস্ব জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে অর্জন করেছি। অথচ এই হতভাগা জানেনা যে, তার চাইতে অনেক শক্তি ও সম্পদের অধিকারী বহু

ব্যক্তিতে তার পূর্বের যামানায় আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছেন।' (সূরা ক্বাছাছ, ২৮ : আয়াত ৭৬-৭৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, ধনের প্রাচুর্য, দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ ও স্বচ্ছলতা পরকালীন জীবনে নাজাতের কোনো দলীল নয়। বরং আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের একমাত্র পথ হলো তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা এবং দ্বীনে হক পরিপূর্ণভাবে কবুল করা।

যেমন কবি আবুল হোসায়েন আহমেদ ইবনে রাবেন্দী আল মুলহিদ বলেন-

كم عالم عالم أعيت مذاهبه * وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا

কত জ্ঞানী-গুনি আছেন যারা ক্ষুধার্ত আর কত মুর্খ আছে যারা প্রাচুর্যে জীবন কাটাচ্ছে।

অপর এক মুরববী বলেন :

رضينا قسمة الجبار فينا * لنا علم وللأعداء مال

فإن المال يفنى عن قريب * وإن العلم باق لا يزال

আমরা পরাক্রমশালী মহান সত্বার বন্টনে সন্তুষ্ট। আমাদের জন্য ইলম-জ্ঞান ও আমাদের শত্রুদের জন্য ধন-সম্পদ। সম্পদ, সে তো অতি সত্বর ধ্বংস হয়ে যাবে, হয়ে যাবে নিঃশেষ। আর ইলম-জ্ঞান থেকে যাবে, নিঃশেষ হবে না কখনো।

অতএব জাহেলী আরবদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল যে, দুনিয়ায় সম্পদশালী হওয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দা হওয়ার একটি প্রমাণ, এ যুক্তি একেবারেই বাতিল। যাদের সামান্য বোধশক্তি আছে, একথা বুঝতে তাদের মোটেই কষ্ট হবার কথা নয়।

১১। সত্যপন্থীরা দুর্বল হওয়ার কারণে মূল সত্যকেই অবজ্ঞা করা

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যেমন আল্লাহ নিজে নূহ আলাইহিস সালামের কওম সম্পর্কে বলেন :

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ (سورة الشعراء : ١٠٥-١١٥)

‘নূহের কওম নবীদেরকে মিথ্যা ধারণা করেছিল। যখন তাদের ভাই নূহ তাদের বললেন, তোমরা কি সংযত হবে না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে অনুসরণ করো। আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোনরূপ প্রতিদান চাই না। এর সবকিছু বদলা আমি বিশ্ব প্রভু আল্লাহর কাছে কামনা করি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। তখন কওমের লোকেরা জওয়াবে বলল- আমরা তোমার উপর ঈমান আনবো, অথচ তোমাকে অনুসরণ করে নীচু স্তরের লোকেরা। নূহ বললেন, তারা কি করছে না করছে তা আমার জানা নেই। তাদের সমস্ত কাজের হিসাব আমার প্রভূর নিকট গচ্ছিত আছে, যদি তোমরা তা বুঝে থাক। আমি মুমিনদেরকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমি স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী ব্যতীত ছিুই নই’ (সূরা শু‘আরা, ২৬ আয়াত ১০৫-১১৫)

হে পাঠক! একবার চিন্তা করো নূহের কওমের কথা। তারা কত হঠকারীভাবে তাদের নবীকে অস্বীকার করলো শুধু এই কারণে যে, তাকে যারা অনুসরণ করছে তারা অর্থ-সম্পদ ও সামাজিক পদ-পর্যাদায় তাদের চাইতে অনেক নীচু। আর এটা এ কারণেই যে, তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দুনিয়া। নতুবা যদি আখিরাত বা পরকাল তাদের চিন্তার বিষয় হতো, তাহলে তারা যেখান থেকেই পাওয়া যাক না কেন সত্যের অনুসারী হতো। কিন্তু তাদের জাহেলিয়াতের কারণে তারা নিজ নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণে সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পক্ষান্তরে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দিকে একবার খেয়াল করে দেখ। স্বীয় গভীর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির কারণে গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর অনুসরণকেই সত্যের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করলেন। যেমন আবু সুফিয়ানের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের মধ্যে একবার তিনি প্রশ্ন করেন যে, গোত্রের শুধু নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করেন, না দূর্বল শ্রেণীর লোকেরা? উত্তর শুনে তিনি বলেছিলেন- সাধারণতঃ দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই নবীদের অনুসারী হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ রাববুল আলামীন পাক কালামে নূহের আলাইহিস সালামের কওমের বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেনঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ (سورة هود : ٢٥-٢٧)

'নূহকে আমরা তার কওমের নিকট প্রেরণ করলাম। তিনি বলেন, আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী। তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। আমি তোমাদের উপর সেই মর্মান্তিক দিবসের আযাবের আশংকা করছি। তখন তার কওমের অবিশ্বাসীরা বলল, তোমাকে আমরা আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছু মনে করি না। আর আমরা দেখছি যে, তোমকে যারা অনুসরণ করে, তারা আমাদের মধ্যে বাহ্যতঃ অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক, (সে কারণে) আমরা তোমাকে আমাদের উপর কোনরূপ মর্যাদা আছে বলে দেখি না। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি'। (সূরা হুদ, ১১: আয়াত ২৫-২৭)

১২। সত্যপন্থীদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা

জাহেলী যুগের লোকদের স্বভাব ছিল যে, তারা সত্যপন্থীদেরকে কপট ও দুনিয়াদার বলে দোষারোপ করতো। আল্লাহ তাদের এই স্বভাবের প্রতিবাদ করেছেন যা ইতোপূর্বে নূহ আলাইহিস সালামের মুখ দিয়ে পবিত্র কালামে আমরা শুনেছি।

কওমের লোকদের ঐসব কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, এই যে, দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নূহের উপর ঈমান এনেছে যাতে তাদের কিছু দুনিয়াবী ফায়দা লুটার মওকা মিলে। কিছু পার্থিব সুবিধা অর্জন করা যায়। এজন্য নয় যে, তারা নূহের দাওয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করে ঈমান এনেছে। এই অন্যায় দোষারোপের প্রতিবাদেই আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত বর্ণনা করেছেন।

১৩। হক পন্থীরা দুর্বল এই অহংকারে হকের সাহায্য থেকে দূরে থাকা

জাহেলী যুগের অন্যতম স্বভাব ছিল যে, তারা হক পথ হতে মুখ ফিরিয়ে নিত অবজ্ঞা ও অহংকার করে, যেহেতু সেখানে দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা ঢুকে পড়েছে।

আল্লাহ এর প্রতিবাদে বলেনঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾ (سورة الأنعام : ٥٢-٥٣)

‘(হে নবী) আপনি ঐ সমস্ত লোকদের দূরে সরিয়ে দেবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ডাকে। তারা কেবলমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে আপনার যেমন কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, আপনার হিসাব নিকাশের ব্যাপারেও তাদের কোনরূপ দায় দায়িত্ব নেই, আপনি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন না, তাহলে আপনি অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। এমনিভাবে আমি একজনকে অপরজনের দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি, যাতে তারা বলে যে, আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ অমুক

অমুক লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত নহেন?' (সূরা আনআম, ৬: আয়াত ৫২-৫৩)

মোদ্দাকথা, এখানে বক্তব্য বিষয় এই যে, ঐসমস্ত দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তারা সত্যিই যুক্তির ভিত্তিতে ঈমান এনেছে কোনো লোভ-লালসা বা নগদপ্রাপ্তির আশায় নহে যেমন ধারণা করেছে তাদের শত্রুরা। কেননা পরকালীন হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে রাসূল বা উম্মত কেউ কারো দায়-দায়িত্ব নেবে না। অতএব তাদের খালেছ ঈমানকে অহেতুক অবজ্ঞা করার কোনো অর্থ হয় না।

১৪। নিজেদেরকে অধিকতর যোগ্য ভেবে অন্যের গৃহীত সত্যকে বাতিল গণ্য করা

সূরা আহক্বাফে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের আচরণ ব্যাখ্যা করেন নিম্নভাবে-

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿سورة الأحقاف : ١٠﴾

‘আপনি ওদেরকে বলে দিন- আচ্ছা যদি এই কুর‘আন যথার্থই আল্লাহর তরফ থেকে হয় এবং তোমরা উহাকে অস্বীকার করতে থাকো এমনিভাবে যদি তোমাদেরই কওম বনী ইসরাইলের মধ্য হতে কেউ উহার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় এবং ঈমান আনয়ন করে আর তোমরা কেবল অহংকার করতেই থাকো, সেমতাবস্থায় তোমাদের রায় কি হবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিচারী যালিমদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।’ (সূরা আল-আহকাফ : আয়াত ১০)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿سورة الأحقاف : ١١﴾

(এ কথার উত্তরে) অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলল- যদি কুর‘আন যথার্থই কোনো উত্তম বস্তু হতো, তাহলে সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই এসব (নিম্ন শ্রেণীর) লোকেরা আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারতো না (কেননা জ্ঞানীরাই প্রথমে উত্তম বস্তু গ্রহণ করে থাকে)। আল্লাহ বলেন), যখন কুর‘আন দ্বারা ওদের হিদায়েত জোটেনি, তখন ওরা একথাই বলবে যে, উহাতো কেবল পুরাতন অলীক বিষয়’। (সূরা আল-আহক্কাফ, ৪৬: আয়াত ১০ ও ১১)

১৫। সঠিক ও ত্রুটিপূর্ণ কিয়াস সম্পর্কে অজ্ঞতা

জাহেলী যুগের লোকেরা নিজেদের অন্যায় দাবীর সমর্থন অযৌক্তিক কিয়াসের আশ্রয় নিত এবং সঠিক কিয়াসকে প্রত্যাখ্যান করতো। পবিত্র কুর'আনুল কারীমে তাদের এই বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿سورة المؤمنون : ٢٣﴾

'আমরা নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করি। তিনি তাদেরকে বলেনঃ হে আমার কওম! তোমরা এক আ্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তোমরা কি (আল্লাহর আযাবের) ভয় করো না'? সূরা আল মুমিনুন, ২৩: আয়াত ২৩)

তখন তার কওমের নেতৃস্থানীয় অবিশ্বাসীরা বললো, এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নয়। সে তোমাদের উপর প্রধান্য বিস্তার করতে চায়। যদি আল্লাহ (সত্যি সত্যিই কোনো নবী প্রেরণ করতে) চাইতেন তাহলে কোনো ফেরেশতাকে (ঐ কাজে) পাঠাতেন। (এ ব্যক্তি যে সমস্ত কথা বলছে) আমরাতো

কখনই এ সব কথা আমাদের বাপ-দাদাদের কাছে শুনিনি। নিশ্চয়ই এই ব্যক্তির সংগে কোনো জিন-ভূত কিংবা পাগলামী আছে। অতএব, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো (যতদিন না এর পাগলামী ছেড়ে যায়)'।

এখানে তারা নবীকে তাদের কুটবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের সংগে কিয়াস করছে। যদিও দৈহিক দিক দিয়ে নবীরা তাদেরই মত মানুষ, তবুও অন্য সকল দিক দিয়ে তাদের সংগে নবীদের যে হাজারো পার্থক্য রয়েছে সে কথা তারা বেমালুম ভুলে গেছে। যেমন আল্লাহ সমগ্র মানুষের মধ্যে নবীদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন তাঁর পয়গাম বহনের জন্য, তাঁর কালামের জন্য, অহীর জন্য প্রভৃতি। অতএব, এই দিক দিয়ে তারা দুনিয়ার অন্য সকল মানুষ হতে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। অথচ জাহেলীরা তাদেরকে নিজেদের উপর কিয়াস করেছেন এবং অন্যায়ভাবে দোষারোপ করেছে। যেমন একালের জাহিলরাও করে থাকে।[৩]

---

[3] লেখক উপরোক্ত আয়াতের শাব্দিক ও ভাবগত বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং কিয়াস সম্পর্কে জানার জন্য ইমাম ইবনে তাহমিয়াহ প্রণীত القياس فى الشرع الإسلامى। বইটি পাঠককে পাঠ করতে বলেছেন। সর্বদিক বিবেচনা করেই

১৬। সৎ লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

জাহেলী যুগের লোকেরা ওলামা ও আউলিয়াদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতো।

আল্লাহ বলেন-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. (سورة التوبة : ٣٠-٣١)

‘ইয়াহূদীরা বলেছে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র, ওদিকে নাছারারা বলে ঈসা মসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের (অবাস্তব) কথা মাত্র। তারাতো তাদের ন্যায়ই কথা বলছে যারা তাদের পূর্বে কাফের হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা কোনো দিকে যাচ্ছে? তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের ধর্ম-যাজক ও পুরোহিতদের প্রভু

এখানে কেবল মূল বক্তব্যটুকু তুলে ধরা হলো। (অনুবাদক)।

বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মাবুদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত মাবুদ হওয়ার যোগ্য কেইউ নেই, তিনি তাদের শরীক স্থির হতে পবিত্র।' (সূরা আত-তাওবাঃ ৯: আয়াত ৩০-৩১)

এখানে 'আহবার' ও 'রুহবান' বা পীর- পুরোহিতদেরকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ এই যে, ঐ সময় তাদের কথার উপরেই হালাল-হারাম নির্ধারিত হতো। বাঁচার জন্য কিংবা কোনো কিছুর মঙ্গলের আশায় এদেরকেই ডাকতো। তাদেরই উত্তরসূরীরা আজও বেঁচে আছে পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন প্রান্তে। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। তিনি বলেছেন - 'অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে'। (হাদীস)।

যার ফলে আজ আমরা অধিকাংশ লোককে দেখি আল্লাহ ও তাঁর সত্য দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রকমারী বেদআতে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর ধু-ধু ময়দানে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। কিতাব ও সুন্নাহ এবং তার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে

লড়ছে। ফলে দ্বীন আজ তাদের কাছে যেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে। ইসলাম আজ প্রকাশ্য বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে।

১৭। না বুঝার অজুহাত

জাহেলী যুগের লোকেরা আল্লাহর অহীর তাৎপর্য বুঝতে না পারার অজুহাত দিয়ে ইসলাম থেকে দূরে থাকতে চাইতো। যেমন আল্লাহ রাববুল ‘আলামীন বলেনঃ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ (سورة البقرة : ٨٧-٨٨)

‘যখন তোমাদের কাছে তোমাদের ইচ্ছার বিরোধী কোনো দাওয়াত নিয়ে রাসূল আগমন করেন, তখন তোমরা অহংকার দেখাও। অতঃপর তোমাদের একদল তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে, অন্য দল তাকে হত্য করে। তারা বলে যে, আমাদের অন্তরগুলো আচ্ছাদিত, বরং তাদের এই অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহর তাদেরকে লা’নত করেন’। (সূরা বাক্বারা, ২: আয়াত ৮৭-৮৮)

অন্যত্র পবিত্র কুর'আনের প্রতি মানুষের আচরণ প্রসঙ্গে বলেনঃ

فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴿٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ (سورة فصلت / حم السجدة : ٤-٦)

'অতঃপর তাদের অধিকাংশ তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিল, তারা উহার বাণীর প্রতি কর্ণপাত করলো না। তারা বলত যে, তোমরা আমাদেরকে যেদিকে আহবান করছো ঐ সব বিষয়ের জন্য আমাদের অন্তরগুলি আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমাদের কানগুলি বধির হয়ে গেছে এবং তোমাদের ও আমাদের মাঝে একটি পর্দা পড়ে গেছে। অতএব তোমরা তোমাদের কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করি। হে নবী ! আপনি বলুন যে, আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। (পার্থক্য এতটুকুই যে) আমার নিকট 'অহী' আসে। নিশ্চয়ই তোমাদের রব মাত্র একজন। অতএব, তাঁর প্রতি সোজা হয়ে চলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য'। (সূরা হা-মীম সাজদাহ্ / ফুছছিলাত, ৪১: আয়াত ৪-৬)

বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে তারা রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাশ করতে চাইতো, যাতে তিনি তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো হতে বিরত থাকেন এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. কাতাদাহ্ রা. ও সুদ্দী রা. বলেন- তাদের অন্তরসমূহ আবৃত অর্থাৎ ইলম ও জ্ঞানে ভরপুর। অবিশ্বাসীরা মনে করতো যে, তাদের কাছে যে জ্ঞান আছে তাই-ই যথেষ্ট। (অতএব নবীর কি দরকার)। কেউ কেউ উক্ত আয়াতের তাফসীর করেছেন যে, কাফিররা মনে করতো যে, তাদের অন্তরগুলি জ্ঞানের ভান্ডার। অতএব, তাদের পক্ষে কোনো মূর্খ নবীর অনুসরণ করা মোটেই ঠিক নয়।

এমনিভাবে মাদায়েনবাসীরা শু'আইব আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল-

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿سورة هود : ٩١﴾

‘হে শুআইব! তুমি যে সব কথা বলো ওসবের কিছু আমরা বুঝি না। আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল দেখি। যদি তোমার কওম না থাকতো তাহলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করতাম। আর তুমি আমাদের উপর মোটেই ক্ষমতাবান নও’। (সূরা হুদ, ১১: আয়াত ৯১)

উপরোক্ত সমস্ত আয়াতগুলি প্রায় একই অর্থ বহন করছে যে, অবিশ্বাসীরা নিজেদের হঠকারিতাকে ঢেকে রাখবার জন্য অহী বুঝতে না পারার খোঁড়া অজুহাত পেশ করতো। আল্লাহ তাদের এই মিথ্যা অজুহাতকে বার বার মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন বিভিন্ন আয়াতসমূহে এবং বর্ণনা করেছেন যে, এই না বোঝার অর্থ আসলে ‘বুঝতে না চাওয়া’, ‘বুঝতে না পারা’ নয়।

কবি মা‘আরী বলেছেন :

والنجم تستصغر الأبصار صورته ، والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر

তারকারাজির সৌন্দর্য অনুধাবন করতে চক্ষু অক্ষম। এই অক্ষমতার জন্য চক্ষু দায়ী, তারকা নয়।

১৮। দলীয় নীতির বিরোধী হওয়ায় সত্যকে অস্বীকার করা

জাহেলী যুগের লোকদের অন্যতম স্বভাব ছিল এই যে, তারা কেবল সেই সকল সত্যকে স্বীকার করতো, যেগুলি তাদের গোত্র বা সম্প্রদায় মেনে নিত।

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

﴿سورة البقرة : ٩١﴾

'যখন তাদেরকে কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে বলা হলো তখন তারা বললো- আমাদের নিকট যে কিতাব নাযিল হয়েছে কেবল তার উপরেই আমরা ঈমান আনবো। (এই ভাবে) তারা এর বাইরে সব কিছুকে অস্বীকার করে। অথচ কুরআন হল সত্য এবং তাদের নিকট ইতোপূর্বে আগত কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। (হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি (তাওরাতের প্রতি) সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে থাকো তাহলে কেন ইতোপূর্বে আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছিলে?' (সূরা আল-বাক্বারা, ২ : আয়াত ৯১)

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথার উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় তারা বলে দিয়েছে যে, তারা চিরকাল তাওরাতের ও তার আদেশ-নিষেধের উপরই ঈমান রাখবে। এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, কুরআনের উপরে তারা ঈমান আনতে চায় না এই হিংসা ও হঠকারিতার কারণে যে তা তাদের বর্ণের মধ্যে কারোর উপরে নাযিল হয়নি।

১৯। জাদুর অলৌকিক ক্রিয়া-কান্ডকে অভ্রান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ করা

তাদের অন্যতম স্বভাব ছিল যে, তারা আল্লাহর কিতাবের বদলে যাদুর কিতাবসমূহ সংগ্রহ করতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا

يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ (سورة البقرة : ١٠١-١٠٢)

'যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল এলেন, যিনি তাদের নিকট ইতোপূর্বে নাযিলকৃত কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যকার একটি দল আল্লাহর কিতাবকে ছুড়ে ফেলে দিল। তারা যেন কিছুই জানে না। সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তান যা তাদেরকে পড়ে শুনাতো, তারা তারই অনুসরণ করতো। সুলায়মান অবিশ্বাসী ছিলেন না। বরং শয়তানই অবিশ্বাসী কাফির ছিল। তারা লোকদেরকে যাদু শিখাতো। অধিকন্তু তারা অনুসরণ করতো হারুত ও মারুত নামক দুই ফেরেশতার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার। তারা কাউকে কিছু শিখাবার পূর্বে বলে দিত যে, আমরা ফিৎনার মধ্যে আছি। অতএব, তোমরা (আমাদের কথায় ও কাজের ফলে) কাফির হয়ে যেয়ো না। (এতদসত্ত্বেও) লোকেরা তাদের নিকট থেকে শিখে নিতো এমনকি

যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হয়। যদিও আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তারা কারো কোনরূপ ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। (সূরা বাক্কারা, ২ : আয়াত ১০১-১০২)

উপরোক্ত জাহেলী স্বভাব আজকাল বহু লোকের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ করে যারা সাধু লোকদের বংশধর কিংবা তাদের দিকে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করে। যদিও তারা সেই সব সৎ লোকদের আমল-আখলাক হতে বহু দুরে, তথাপি তাদের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী। যাদুর অলৌকিক ক্রিয়া-কান্ড তারা দেখায়, যেগুলোকে শরীয়ত সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষণ করেছে।

যেমন- বিসাক্ত সাপ ধরে ফেলা, কাউকে অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা, আগুনের মধ্যে প্রবেশ করা প্রভৃতি। তারা শরীয়তকে অগ্রাহ্য করেছে। আল্লাহর কিতাবকে পিছনে নিক্ষেপ করেছে এবং শয়তানের অনুসরণ করেছে। অথচ এগুলিকে তারা নিজেদের কেরামতি বলে দাবী করেছে। যদিও কোনো ফাসিকের দ্বারা কেরামত প্রকাশ পেতে পারে না। যারা উপরোক্ত ক্রিয়া-কান্ড দেখায় তাদের ফাসেকী স্পষ্ট। তারা দ্বীনকে খেল-তামাসার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। এদেরই উদ্দেশ্যে আল্লাহ বরেন-

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾سورة الكهف : ١٠٤﴿

'এরা দুনিয়াতে কেবল পন্ডশ্রম করছে অথচ ভাবছে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করছে'। (সূরা কাহাফ, ১৮ : আয়াত ১০৪)

২০। বংশ সম্বন্ধে পরিবর্তন করা

তারা নিজেদের মূল বংশ সম্বন্ধে পরিবর্তন করে ফেলত। কখনো ইবরাহীমের (আ:) দিকে সম্পর্কিত করতো এবং সেজন্য নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করতো অথচ প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতো। এবং ইসলাম বিরোধীদের দিকে নিজেদের সম্বন্ধ গড়তো।

২১। আল্লাহর কালামের মূল বক্তব্যে হেরফের ঘটানো

আল্লাহর কালামের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থে তারা বিকৃত ব্যাখ্যা করতো। আজকাল এ ধরণের লোকের মোটেই

অভাব নেই যারা আল্লাহর কালামের মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে সদা প্রস্তুত।

২২। দ্বীনি কিতাবসমূহে তাহরীফ

জাহেলী যুগের আলিমরা মূল ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের পরিবর্তন ঘটাতো।

আল্লাহ ইয়াহূদী আলিমদের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

((البقرة : ٧٨-٧٩

তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে, যারা আশা-আকাংখা ব্যতীত গ্রন্থ সম্পর্কে জানে না। শুধু কল্পনা রচনা করে থাকে। তাদের জন্য ধ্বংস, যারা স্ব হস্তে গ্রন্থ রচনা করে এবং বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে আগত। এর দ্বারা তারা সামান্য মুল্য অর্জন করেছে। তাদের হাত যা লিখেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ

এবং তারা যা উপার্জন করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ। (সূরা আল-বাক্বারা, ২ : আয়াত ৭৮-৮৯)

যারা বর্তমান যুগের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের দিকে দৃষ্টি দিবেন, তারা স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে, কিভাবে এরা আইনকে খেল-তামাসায় পরিণত করছে। তারা ইচ্ছামত কুরআন ও সুন্নাহর ফয়সালাকে পরিবর্তন করে এবং ঘুষের বিনিময়ে সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করে। এইভাবে অসংখ্য দুর্নীতি যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যা এ যুগের সবচেয়ে বড় মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। এমনিভাবে বিদ'আতী ও কবর পূজারীর দল তো আছেই যাদের সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা এসেছে।[৪]

২৩। দ্বীনের হিদায়েত ছেড়ে দ্বীন-বিরোধী পথের অনুগমন

এ ছিল জাহেলী যুগের এক আজব স্বভাব। তারা খাটি দ্বীনের সংগে কঠিন শত্রুতায় লিপ্ত হতো। অন্যদিকে কাফিরদের দ্বীনের সংগে পূর্ণ প্রীতি স্থাপন করতো। যেমন ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে করেছিল। তিনি মূসার (আঃ) দ্বীন (উহার

[4] তুর্কী খিলাফতের আমলে এটা লেখা হয়। (অনুবাদক)।

মূলনীতি) নিয়ে এসেছিলেন, অথচ তারা যাদু বিদ্যার বইসমূহ অনুসরণ করতে লাগলো যা ছিল ফিরাউনের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিমদের মধ্যে আজকাল এরূপ লোকের কোনই কমতি নেই যার সুন্নাহ ত্যাগ করেছে। এমনকি তার সংগে শত্রুতাও করে থাকে। অথচ তারা দার্শনিকদের কথা ও নির্দেশসমূহের সহায়তা করে।

২৪। অন্যের অনুসৃত সত্যকে অস্বীকার করা

যখন তারা বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়, তখন প্রতিটি ফিরকা তাদের গৃহীত মতামতকে চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করতো এবং তাদের বিপক্ষীয় দলের নিকট বাস্তবিক কোনো সত্য থাকলেও তাকে অস্বীকার করতো। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ (سورة البقرة : ١١٣)

'ইয়াহূদীরা বলতো খৃষ্টানদের কোনো ভিত্তি নেই। তেমনি খৃষ্টানেরা বলতো ইয়াহূদীরা কোনো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ তারা সবই আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জীল) পড়তো। এমনি ধরণের কথা কেবল মুর্খরাই বলে থাকে। আল্লাহ তাদের মধ্যকার এই বিবাদ ফয়সালা করবেন কেয়ামতের দিন'। (সূরা আল-বাক্বারা, ২ : আয়াত ১১৩)

জাহেরী যুগের উপরোক্ত স্বভাব নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগেও বহু লোকের মধ্যে বিদ্যমান। বিশেষ করে বিভিন্ন মাযহাবী নেতাদের মধ্যে। কেননা প্রত্যেক মাযহাবপন্থীই মনে করেন যে, দ্বীন কেবল তার মাযহাবেই আছে, অন্যের মধ্যে নয়। এজন্যই তো আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন- 'প্রত্যেক দলই নিজেরটা নিয়ে সন্তুষ্ট।'

কবি বলেন :

وكل يدّعى وصلاً لليلى ، وليلى لا تقرّ لهم بذاكا.

"প্রত্যেকেই লাইলীর প্রেমের দাবীদার। অথচ লাইলী তাদের কাউকে স্বীকার করে না।"

বুদ্ধিমানের কাজ হলো দলীল তালাশ করা। যে বিষয়ে সঠিক দলীল পাওয়া যাবে সেটাই সত্য ও গ্রহণযোগ্য।

পক্ষান্তরে যার উপরে কোনো দলীল প্রমাণ পাওয়া যাবে না তা পিছনে ছুঁড়ে ফিলে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার প্রত্যেকের কথাই গ্রহণ বা বর্জন যোগ্য কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ব্যতীত।

২৫। প্রত্যেক দলের এই দাবী করা যে, সত্য কেবল তার মাঝেই নিহিত

আমার উম্মাত অদূর ভবিষ্যতে ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক দলই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস যখন লোকেরা শুনলো তখন প্রত্যেক দলই নিজেদেরকে “নাজী ফিরকা” বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে দাবী করলো। যদিও ঐ হাদীসের শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাবেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা

হলো ঐ দল যারা আমার ও আমার ছাহাবাদের তরীকার উপর কায়েম থাকবে।

এমনি ভাবে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা নিজ নিজ দলের "নাজী" বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়ার দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ বলেন-

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

(سورة البقرة : ١١١-١١٢)

'এসব তাদের খোশ-খেয়াল মাত্র। হে নবী ! আপনি বলে দিন, তারা যদি নিজ নিজ দাবীতে সত্য হয়, তাহলে যেন দলীল পেশ করে। অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করেছে এবং সে যদি সৎকর্মশীল হয়, তাহলে তার রবের নিকট তার জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই বা সংকিত হবারও কোনো কারণ নেই'। (সূরা বাক্বারা, ২ : আয়াত ১১১-১১২ আয়াত)

আবুল আব্বাস তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়াহ রহ. স্বীয় কিতাব "মিনহাজুস সুন্নাহ'র" মধ্যে নাজী ফিরকার বিষয়ে উপরোক্ত হাদীসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে হাদীসটির ভিত্তিতে শিয়া-

রাফেযিরাও নিজেদেরকে ‘নাজী ফিরকার’ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে বাতিল ফিরকা বলে দাবী করে। অথচ রাফেযিরা হচ্ছে বাতিল ফিরকা। যদি কেউ অধিক জানতে চান তবে যেন ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর উক্ত কিতাবখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নেন।

২৬। দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও কোনো বস্তুকে অস্বীকার করা

যেমন তারা হজ্জ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এটাকে তারা তাদের দ্বীনের অংশ বলে স্বীকার করেছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তা করতে অস্বীকার করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (سورة البقرة : ١٢٥)

যখন আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্য তীর্থ স্থান ও নিরাপত্তা স্থল হিসাবে গ্রহণ করলাম এবং লোকদেরকে বললাম যে, তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানো স্থানকেই ‘মুছাল্লা’ বা ছালাতের স্থান হিসাবে

গ্রহণ করো। (কিন্তু, কাফিররা তা না করে কাবা ঘরে প্রতিমা রাখে এবং ওর পূজা শুরু করে দেয়, যদিও মুখে ইবরাহীমের অনুসারী বলে দাবী করতো)। আল্লাহ তাদের এই আচরণের প্রতি ধিক্কার দিয়ে বলেন-

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ (سورة البقرة : ١٣٠)

'যারা নিজেদেরকে (ইচ্ছাকৃতভাবে) নির্বোধ গণ্য করেছে, কেবল তারাই ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, অথচ আল্লাহ তাকেই দুনিয়ার মধ্যে হতে নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি আখিরাতে অবশ্যই নেককার বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবেন'। (সূরা বাক্বারা, ২ : আয়াত ১২৫-১৩০)

শেষোক্ত আয়াতটি নাযিলের কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে, প্রখ্যাত ইয়াহূদী পন্ডিত (পরে মুসলিম) আব্দুল্লাহ ইবন সালাম সালমা ও মুহাজির নামীর স্বীয় দুই ভাতিজাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই একথা জানো যে, আল্লাহ পাক তাওরাতে বলেছেন, আমি ইসমাঈলের বংশে আহমদ নামে একজন

নবীকে পাঠাবো। যারা তার উপর ঈমান আনবে তারা হিদায়েত প্রাপ্ত হবে এবং যারা ঈমান আনবে না তারা হবে অভিশপ্ত। একথা শুনে ভাতিজা দু’জনেই মুসলিম হয়ে গেল। এ ঘটনার পরেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

২৭। নগ্নতার প্রদর্শনী

কাফিররা নগ্নতার প্রদর্শনী করতো এবং এর পক্ষে বিভিন্ন অপযুক্তি খাড়া করতো।[৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ (سورة الأعراف : ٢٨)

'যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করতো তখন বলতো, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এ কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ কাজে অনুমতি দিয়েছেন। আপনি বলে দিন (হে নবী) নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অশ্লীল কাজের অনুমতি দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে চাও যা তোমরা জানো না'? (সূরা আরাফ, ৭: আয়াত ২৮)

---

[5] আজকের দিনে এরা নিজেদেরকে প্রগতিশীল এবং নগ্নতা বিরোধীদেরকে সেকেলে কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল বলে থাকে। (অনুবাদক)।

মুফাসসীরগণ বলেন : এখানে অশ্লীল কাজ অর্থ[৬] প্রতিমা পূজা করা এবং কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) উলংগ হয়ে তাওয়াফ করা ইত্যাদি।[৭]

ফাররা বলেন- শুধুমাত্র উলঙ্গ হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। কাফিররা তাদের এই বেহায়াপনার পক্ষে দুটি যুক্তি খাড়া করেছে। (এক) বাপ-দাদাদের রীতি রেওয়াজের অন্ধ অনুসরণ এবং (দুই) আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ।

তাদের নেতাদের নিয়ম ছিল এই যে, তারা হজ্জের মওসুমে আরাফাতের ময়দানে না গিয়ে মুজদালিফায় যেয়ে অবস্থান (ওকুফ) করতো। তারা এই সময় ঘি গরম করতো না, পনির খেতো না, কোনো ছাগল-বকরী কিংবা গরু বাঁধতো না, উট বা ভেড়ার পশম দিয়ে সূতা কাটতো না, কোনো পশমের বা কাদার তৈরী ঘরে ঢুকতো না। তারা সম্মানিত চারটি মাস লাল গম্বুজওয়ালা ঘরে লুকিয়ে

---

[6] এখানে লেখক কিছু ব্যাকরণগত আলোচনা করেছেন। (অনুবাদক)

[7] আজকের তথাকথিত উন্নত সভ্যতার যুগে এই উলংগপনা হাটে, ঘাটে, শিক্ষাঙ্গনে, সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, টিভি-সিনেমাতে সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করেছে। (অনুবাদক)

থাকতো। তারা আরবদের উপর কঠোরভাবে নিয়ম করে দিয়েছিল যেন হারাম শরীফে ঢুকবার পূর্বে তারা হালাল অবস্থার সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র ফেলে দেয় এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করে। চাই সেই পোশাক ক্রয়ের মাধ্যমে হোক বা ধারসূত্রে কিংবা দানসূত্রে প্রাপ্ত হোক। যদি তা না পায় তবে সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ করতে হবে। মেয়েদের উপরোক্ত একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। বরং মেয়েরা তাদের দু’পা ও নিতম্বদ্বয় ফাঁকা করে তাওয়াফ করতো। এমনিভাবে তাওয়াফ করা অবস্থায় যাবাআ বিনতে আমের নামক এক মহিলা গেয়েছিলঃ-

اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فلا أحله

‘আজকের দিনের (লজ্জাস্থানের) (কিছু অংশ বা সম্পূর্ণটা প্রকাশ হয়ে পড়লো। তবে যেটুকু প্রকাশিত হলো আমি তাকে হালাল করবো না।’

তারা নিজেরা মুযদালিফা থেকেই ফিরে আসত। অপর লোকেরা আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসত। এমনি ধরনের বহু নতুন নতুন রেওয়াজ তারা চালু করেছিল, যে সম্পর্কে আল্লাহ কোনরূপ

নির্দেশ পাঠাননি। এতদসত্ত্বেও তারা পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাতের উপর কায়েম আছে বলে গালভরা দাবী করতো। আসলে এসব তাদের নিতান্তই মুর্খতা ছাড়া আর কিছুই ছিল।

আজকের দিনেও যে সমস্ত লোক ইসলামের দিকে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করেন, তাদের অধিকাংশই দ্বীনের মধ্যে এমন এমন বিদ‘আতী রেওয়াজ চালু করেছেন যে সম্পর্কে আল্লাহর কোনো নির্দেশ নেই। যেমন কেউ কেউ আল্লাহর ঘরসমূহে বাদ্য-বাজনার মাধ্যমে ইবাদত অনুষ্ঠান করে থাকে, কেউ কবর প্রদক্ষিণ করে থাকে, কেউ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়, কেউ তার খালেছ আনুগত্য ঢেলে দিয়ে তার সর্বোত্তম কুরবানীটুকু কবরের উদ্দেশ্যে মানত করে। কেউ বা সাধুগিরি ও শয়তানী ধোকাবাজির পন্থা আবিষ্কার করেছে এবং মনে করছে যে, সে সূফী-দরবেশদের তরীকা অবলম্বন করেছে। আসলে তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বীয় পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং সংকীর্ণ দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করা। এই ধরনের কত যে অপকীর্তি ধর্মের নামে চলছে, তার ইয়ত্তা নেই। কবির কথায়-

إلى ديّان يوم الدين نمضى ، وعند الله تجتمع الخصوم.

‘ক্বিয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণকারীর নিকট আমরা সবাই চলেছি এবং আল্লাহর নিকটেই বাদী-বিবাদী সকলে একত্রিত হবে’।

২৮। হালাল বস্তুকে হারাম করে ‘ইবাদতে লিপ্ত হওয়া

জাহেলী যুগে এটা প্রচলিত ছিল (যেমন তারা তাওয়াফের সময় কাপড় পরতো না, হজ্জের মওসুমে চর্বি খেতো না ইত্যাদি)। আল্লাহ এ সবের প্রতিবাদ করে বলেন-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ (سورة الأعراف : ٣١-٣٣)

‘হে বনী আদম! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোষাক পরিধান করো। তোমরা নিয়মিত আহার করো, পান করো, কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেন না।

(হে নবী) আপনি বলে দিন, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্য সম্ভার ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তাকে তাদের জন্য কে হারাম করেছে ? বলে দিন, এ সবই মুমিনদের জন্য, তাদের পার্থিব জীবনে ও বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে। এইরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমরা নিদর্শনগুলি বিশদভাবে বিবৃত করি। (হে নবী) আপনি বলে দিন যে, আমার প্রভু নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, সকল প্রকারের পাপকার্য, অসংগত বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে শির্ক- যে সম্পর্কে কোনো দলিল তিনি নাযিল করেননি এবং নিষিদ্ধ করেছেন, আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলা, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই'। (সূরা আ'রাফ, ৭: আয়াত ৩১-৩৩)

প্রথম আয়াতটি নাযিলের কারণ হলো যে, বেদুঈন আরবদের অনেকে উলংগ হয়ে পবিত্র কাবাঘর 'তাওয়াফ' (প্রদক্ষিণ) করতো। এমনকি মেয়েরাও উলংগ হয়ে অনুরূপ করতো এবং গান গেতো। যার কিছু উদ্ধৃতি পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কালবী বলেন যে, হজ্জের মওসুমে আরবরা বেঁচে থাকার মত যৎসামান্য আহার করতো। তা হজ্জের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই সময়ে কোনো চর্বিযুক্ত খাবার

খেতো না। এ অবস্থায় মুসলিমরা আল্লাহর নবীকে বললেন যে, আমরাই তো হজ্জের সম্মান রক্ষার অধিক হকদার। তখন আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, মানুষের কল্যাণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য সৃষ্ট সূতী, কাতান, রেশমী প্রভৃতি বস্ত্রসমূহ এবং খাসী ও গরুর গোস্ত, চর্বি, দুধ প্রভৃতি যাবতীয় হালাল খাদ্যসমূহ তাদের জন্য সব সময়ই হালাল। মু'মিনদের জন্য এগুলো খাছ এজন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা সর্বাধিক। সুতরাং এ সকল নিয়ামতের প্রকৃত হকদার তারাই। তবে অবিশ্বাসীরাও এসব ভোগ করতে পারবে সাধারণভাবে মুমিনদের অনুসরণে। অবশ্য পরকালীন জীবনে এ সমস্ত সৌন্দর্য সম্ভার উপভোগের অধিকারী হবেন কেবলমাত্র মুমিনরাই।

তৃতীয় আয়াতে 'প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার' ব্যাখ্যায় কোনো কোন মুফাসসীর 'প্রকাশ্য ও গোপন ব্যাভিচার' বলেছেন। আরবরা প্রকাশ্য ব্যাভিচার অপছন্দ করতো। কিন্তু গোপনে একাজে অভ্যস্ত ছিল। মুজাহিদ বলেন, 'প্রকাশ্য অশ্লীলতা' অর্থে 'উলঙ্গ তাওয়াফ' এবং 'গোপন অশ্লীলতা' অর্থে ব্যাভিচার বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ

বলেন, ‘প্রকাশ্য’ অর্থে পুরুষদের দিবসে উলংগ তাওয়াফ বুঝানো হয়েছে।

‘পাপকর্ম’ বলতে সব ধরনের পাপাচার বুঝানো হয়েছে। তবে কেউ কেউ আরবদের কবিতায় ব্যবহৃত উক্ত শব্দের প্রচলিত অর্থের দিকে খেয়াল করে এখানে ‘মদের’ অর্থ করেছেন।[৮]

‘শির্ক- যে সম্পর্কে কোনো দলীল আল্লাহ নাযিল করেননি’ এর দ্বারা আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন- তারা নিজেদের অপকর্মের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়ে বলতো যে-

﴿وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ﴾ [الاعراف: ٢٨]

‘আল্লাহ আমাদের এসব করতে বলেছেন’। (সূরা আ’রাফ, ৭: আয়াত ২৮)

---

[৮] نهانا رسول الله أن نقرب الزنا ، وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যিনার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন এবং নিষেধ করেছেন মদ্য পান করতে, যার দ্বারা গুনাহ, অপরিহার্য।

একথা সবারই জানা যে, আমাদের যামানার সুফী ছাহেবদের মধ্যে জাহেলী যুগের ঐ সকল স্বভাব ঢুকে পড়েছে। তাঁরা লোকদের কাছে নিজেদের সুফীগিরি দেখানোর জন্য ভাল পোষাক ও ভাল খাবার ত্যাগ করেন। তাঁরা নিঃসঙ্গভাবে হুজরায় ও খানকায় বসে নিজেদের কপোলকল্পিত বিভিন্ন বিদ'আতী তরীকায় মুরাকাবা-মুশাহাদা, ইশ্ক ও যিকরে মশগুল থাকেন। অথচ তাঁরা জানেন না যে, এর দ্বারা তারা আল্লাহ বর্ণিত ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন- "যারা তাদের সারাটি জীবন বরবাদ করেছে অথচ ভাবছে যে, তারা অত্যন্ত ভাল কাজ করছে"। (সূরা কাহাফ, ১৮ : আয়াত ১০৪)

২৯। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিকৃত করা

জাহেলী যুগের লোকদের এ স্বভাব ছিল। আল্লাহ তার প্রতিবাদ করে বলেন-

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ (سورة الأعراف : ١٨٠)

'উত্তম নামসমূহ আল্লাহর জন্যই, তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাকো এবং যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করেছে তাদেরকে পরিত্যাগ

করো। তারা অতিসত্ত্বর তাদের কৃতকর্মের ফল পাবে’। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : আয়াত ১৮০)

আল্লাহর নাম বিকৃত করা অর্থ তাঁকে এমন নামে ডাকা যা উদ্দেশ্য নয়। অথবা যার দ্বারা কোনো বাজে অর্থ কল্পনা করা যেতে পারে। যেমন- কোনো বেদুঈনের ডাক ‘ইয়া আবাল মাকারিম’ (হে দানশীলদের পিতা) ‘ইয়া আবয়াদাল ওয়াজহি’ (হে সফেদ চেহারার অধিকারী) ‘‘ইয়া সাখিইউ’ (হে দাতা) প্রভৃতি। এগুলো তারা তাদের ধারণা মাফিক বলতো। প্রকৃত অর্থে এগুলো আল্লাহর নাম নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾ (سورة الرعد : ٣٠)

‘ইতোপূর্বে বিভিন্ন জাতির নিকট যেমন (নবী) পাঠিয়েছিলাম, তেমনি আপনাকেও একটি জাতির নিকট পাঠিয়েছি, কেবল আমার অহীসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবার জন্য। অথচ তারা ‘রহমান’ কে অস্বীকার করেছে। আপনি বলে দিন যে, ‘তিনিই আমার প্রতিপালক’। তিনি

ব্যতীত আমার অন্য কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই। তাঁর উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন'। (সূরা আর-রা'দ, ১৩ : আয়াত ৩০)

কাতাদাহ, ইবনু জুরায়েজ ও মুকাতিল হতে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াতটি মক্কায় মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ হতে আলী রা. লিখিত পত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দেখে তাদের প্রতিনিধি সোহায়েল ইবন আমর বলে ওঠে আমরা 'রহমান' বলে কাউকে জানি না। কোনো কোন তাফসীরকারের মতে আবু জেহেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইয়া আল্লাহ' ইয়া রহমান' বলতে শুনে বলে ওঠে যে, 'মুহাম্মাদ আমাদেরকে বহু মা'বুদের উপাসনা করতে নিষেধ করে, অথচ সে নিজে দুই মা'বুদকে ডাকছে। জওয়াবে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। কারো কারো মতে- যখন কাফিরদেরকে বলা হলো 'তোমরা রহমানকে সিজদা করো' তখন তারা বলে 'রহমান' কি বস্তু ? এই সময় উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

এভাবে আল্লাহর নামসমূহ বিকৃত করার সাথে সাথে তারা আল্লাহর গুণাবলীরও বিকৃত অর্থ গ্রহণ করেছিল। যেমন- আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একদা আমি কা'বা শরীফের আড়ালে বসেছিলাম। এমন সময় একজন কুরায়শী ও দু'জন ছাকাফী অথবা একজন ছাকাফী ও দু'জন কুরায়শী সেখানে এলো। বিরাট দেহধারী ছিল তারা। কিন্তু মগজে কিছুই ছিল না। তাদের একজন বলল, 'আচ্ছা আমাদের এই নীরব কথাবার্তা কি আল্লাহ শুনতে পাচ্ছেন'? উত্তরে অন্যজন বলল, যদি আমরা জোরে বলি তাহলে শুনতে পাবেন নইলে পাবেন না'। আরেকজন বলল, যদি তিনি আমাদের কথাবার্তার কিছু অংশ শুনে ফেলেন, তাহলে তিনি সবই শুনে নিবেন'। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি এই ঘটনা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট বর্ণনা করলে নিম্নের আয়াত নাযিল হয়-

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا

مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ (سورة حم السجدة : ٢١-٢٣)

'কিয়ামতের দিন আল্লাহর শত্রুরা স্ব-স্ব গাত্র চর্মকে লক্ষ্য করে বলবে, কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ ? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলবার ক্ষমতা দিয়েছেন, যেমন অন্য সকল বস্তুকে তিনি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর কাছেই তোমরা সবাই ফিরে যাবে। তোমাদের চক্ষু, কর্ণ ও গাত্রচর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, এই ভয়ে তোমরা সংগোপনে কথা বলে থাকো। আসলে তোমরা মনে করে থাকো যে, তোমরা যা করো তার বেশীকিছু আল্লাহ জানেন না। এটা প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের একটা ভিত্তিহীন ধারণা মাত্র। এই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করবে। অতঃপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। (সূরা হা-মীম সিজদাহ, ৪১: আয়াত ২১-২৩)

উপরোক্ত আলোচনায় আল্লাহর (শ্রবনকারী, দর্শনকারী প্রভৃতি) গুণাবলী সম্পর্কে তাদের বিকৃত অর্থ গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রিয় পাঠক ! আপনি ভাল করেই জানেন যে, মুসলিম কালাম

শাস্ত্রবিদগণের[৭] মধ্যে অধিকাংশ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জাহেলী যুগের লোকদের চাইতেও অধিক বিকৃত ধারণা করে থাকেন। তারা আল্লাহর এমন সব নাম রেখেছেন, যার কোনো দলীল আল্লাহ নাযিল করেননি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন- আল্লাহর নিজস্ব কোনো গুণ নেই। কেউ বলেন, 'গুণাবলী তার সত্ত্বা হতে পৃথক বস্তু।' কেউ বলেন, আল্লাহর কিতাবসমূহ আল্লাহর কালাম নয়। তারা 'কালামে নাফসী' নামে আল্লাহর পৃথক কালাম প্রমাণ করতে চান। তারা বলেন যে, আল্লাহ কখনোই কোনো নবীর সংগে কালাম করেননি। এইরূপ বহু ধরনের ইলহাদ ও বাজে বিতর্কে তাদের বই-কিতাবসমূহ পরিপূর্ণ করা হয়েছে। তাঁরা দাবী করেন যে, উপরোক্ত আয়াত কেবলমাত্র জাহেলী যুগের লোকদের জন্য। অথচ তারা একথা বুঝতে নারাজ যে, এ আয়াত সমস্ত মানবজাতিকে শামিল করে। আল্লাহ যাকে দেখবার মত চোখ ও বুঝবার মত মগজ দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই ঐ সব লোকদের বই-পত্র থেকে মুখ

---

[৭] এখানে বিশেষ করে অদ্বৈতবাদী মুসলিম দার্শনিক ও তাদের অনুসারী তথাকথিত মারেফতী পরী ফকিরদের কথাই বলা হয়েছে। (অনুবাদক)

না, শুধু তা নয়, বরং এখানে জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশায়েরা ও মাতুরিদিয়্যা সম্প্রদায়কেও বুঝানো হয়েছে। [সম্পাদক]

ফিরিয়ে নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলীলসমূহ দ্বারা রচিত হকপন্থী আলেম- বিদ্বানদের বই-কিতাবসমূহ পড়বেন এবং আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় লাভে ধন্য হবেন।

৩০। আল্লাহর প্রতি বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি আরোপ

জাহেলী যুগের আরবরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলতো। খৃষ্টানরা ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামকে ও ইয়াহূদীরা ওযায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলতো। একদল দার্শনিক আল্লাহ থেকে আকল বা বিবেক জন্ম হওয়ার কথা কল্পনা করে থাকে। আল্লাহ এসব থেকে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বহু আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ (سورة الأنعام: ١٠٠-١٠٢)

'তারা আল্লাহর সঙ্গে জিনকে শরীক করে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারা আল্লাহর জন্য ছেলে-মেয়ের অলীক কল্পনার

জন্ম দিয়েছে। তারা যা বলে আল্লাহ সেব থেকে উর্দ্ধে ও সম্পূর্ণ পবিত্র। আসমান ও যমীনের স্রষ্টা তিনি। কেমন করে তাঁর সন্তান হতে পারে? যখন তার নেই কোনো স্ত্রী। তিনিই সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল বিষয়ে জ্ঞানী’। (সূরা আল-আন‘আম, ৬: আয়াত ১০০-১০২)

তারা আল্লাহর প্রতি স্বজনপ্রীতি আরোপ করেছিল। অথচ তিনি এসব থেকে উর্দ্ধে। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ (سورة المائدة : ١٨)

‘ইয়াহূদী ও খৃষ্টানেরা দাবী করে থাকে যে, আমরা আল্লাহর বেটা ও তাঁর প্রতি প্রিয়জন। (হে নবী) আপনি ওদেরকে বলে দিন যে, যদি তাই হবে তাহলে অপরাধের জন্য তোমাদেরকে আযাব দেন কেন? তোমরা অন্যান্য সৃষ্টিকুলের মত সাধারণ মানুষ মাত্র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিয়ে থাকেন। আসমান-যমীন ও তন্মধ্যস্থিত সকল কিছুর মালিকানা কেবলমাত্র

তাঁরই এবং তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আল-মায়েদাহ, ৫: আয়াত ১৮)

তারা আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে আল্লাহর মূল সত্ত্বার অংশ সাব্যস্ত করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا (سورة الزخرف : ١٥)

“তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর সত্ত্বার অংশ হিসাবে গণ্য করেছিল”। (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: আয়াত ১৫)

কেননা তারা আল্লাহর ছেলে- মেয়ে সাব্যস্ত করেছিল এবং ছেলে-মেয়েরা বাপের সত্তার অংশ বৈকি। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নিশ্চয়ই ফাতেমা আমার দেহেরই একটি টুকরা’।[10] (হাদীস)

কালবী বলেন, এ আয়াত যিনদীকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যারা বলতো, আল্লাহ ও ইবলীস দুইজন শরীক। আল্লাহ জ্যোতি, মানুষ ও জীবজন্তুসমূহের স্রষ্টা এবং ইবলীস অন্ধকার, হিংস্র, শ্বাপদ, সর্প ও

---

[10] বুখারী, হাদীস নং ২৯৪৩; মুসলিম, ২৪৪৯।

বিচ্ছুসমূহের স্রষ্টা। কেউ কেউ বলতো যে, আল্লাহ ও জিনের মাঝে বিয়ের ফলে ফেরেশতাদের জন্ম হয়। আল্লাহ তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ করেন। বলেন-

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ (سورة الصافات : ١٥٨-١٥٩)

‘তারা আল্লাহ ও জিনের মাঝে বংশ সম্পর্ক কল্পনা করেছে। অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে। আল্লাহ এদের এই সব অলীক বর্ণনাসমূহ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র’। (সূরা আছ-ছাফফাত, ৩৭: আয়াত ১৫৮-১৫৯)

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আল জাওয়াবুছ ছহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ’ ও তাফসীরু সূরাতিল ইখলাছ গ্রন্থসমূহে।[১১]

---

[11] পুণরুক্তি, পূনরাবৃত্তি ও একই মর্মের উল্লেখিত অনেক আয়াতের উদ্ধৃতি ও তরজমা কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বাদ দেওয়া হলো। (অনুবাদক)

৩১। একদিকে তারা স্রষ্টার জন্য সৃষ্টির গুণাগুণ সাব্যস্ত করছে, অপরদিকে তারা কোনো কোনো সৃষ্ট মাখলুক থেকে এসব গুণ অস্বীকার করছে।

নাসারাদের সাধু সন্যাসীরা স্ত্রী গ্রহণ ও সন্তান পালন হতে বিরত থাকতো এবং বলতো যে, 'কামালিয়াত' হাছিল করতে ইচ্ছুক পাদ্রী পুরোহিত ও সাধু-সন্যাসীদেরকে ঈসা মসীহের অনুকরণে স্ত্রী সংসর্গ হতে দূরে থাকতে হবে। এদের নির্বুদ্ধিতা ও বিভ্রান্তি বর্তমানে এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, তারা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈবাহিক জীবন সম্পর্কেও আপত্তি তুলতে চায়। ত্রয়োদশ হিজরী শতকের ইরাকী কবি আব্দুল বাকী ফারুকী জনৈক খৃষ্টান পাদ্রীর সমালোচনার জওয়াবে কত সুন্দরই না বলেছেন-

أنت الذي زعم الزواج نقيصة - ممن حماه الله عن نقصان

ونسيت تزويج الإله بمريم - فى زعم كل مثلث نصرانى. (نعوذ بالله)

'তুমি তোমার পাদ্রী নেতাদের বলো যে, তোমরা বিবাহকে আল্লাহভীরু ও ত্রুটিহীন লোকদের জন্য একটি ত্রুটি বলে মনে

করো। অথচ তোমরা তিন আল্লাহতে বিশ্বাসী ত্রিত্ববাদীরা একথা বেমালুম ভুলে বসেছো যে, মরিয়মকে তোমরা আল্লাহর স্ত্রী বানিয়েছো।’ (নাউযুবিল্লাহ)[১২]

৩২। নাস্তিক্যবাদ

এর অর্থ হলো- সৃষ্টি জগতের কোনো স্রষ্টা আছেন, একথা অস্বীকার করা। যেমন- ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা করতো। ফেরআউন বলেছিল-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. (سورة القصص : ٣٨)

‘আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো প্রভু আছে বলে আমি জানি না।’ (সূরা আল-ক্বাছাছ, ২৮: আয়াত ৩৮)

যুগে যুগে এই ধরণের মূর্খতা হতে পৃথিবী কখনোই খালি থাকেনি। কিছু সংখ্যক আল্লাহর বান্দা ছাড়া বর্তমান যুগের অধিকাংশ আদম সন্তানই উক্ত বাতিল আক্বীদা পোষণ করে থাকে। যদি তারা ন্যায় বিচার ও বিবেকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতো, তাহলে উপলব্ধি করতো

---

12 লেখকের শেষের প্যারাটি অপ্রয়োজনে বাদ দেওয়া হলো। (অনুবাদক)

যে, এ পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিই তার স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ। করিব ভাষায়-

وفي كل شيء له آيـــة * تـــدل على أنه واحد

'প্রতিটি বস্তুর মধ্যে রয়েছে তাঁর নিদর্শন, যা প্রমাণ দেয় যে তিনি এক।'

আসমান জগতে এবং আমাদের নিজেদের দেহে ও চরিত্রে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিলতা দেখতে পাই, তার প্রকৃত মর্ম উদঘাটন করা আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব? এসব আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার সম্পূর্ণ বাইরে। আসলে লোকেরা যেসব কথা বলে, আল্লাহ সেসব থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

৩৩। আল্লাহর মালিকানায় শরীক করা

যেমন মাজুসী-অগ্নি উপাসকরা জ্যোতি, আগুন, পানি ও মাটিকে সম্মান করতো। 'জরথস্তুকে' নবী মানতো। তাদের নিজস্ব শরীয়ত বা নিয়ম-নীতি ছিল তারা যার অনুসরণ করতো। তাদের মধ্যে বহু দল ছিল।

যেমন মাযদাকের অনুসারী মাযদাকিয়া দল। মাযদাক তাদের একজন বড় আলেমের নাম। তার মতে নারী জাতি ও ধন-সম্পদ হবে জাতীয় সম্পদ। প্রত্যেকের স্ত্রী ও ধন-সম্পদের উপর অন্যের সমান অধিকার থাকবে যেমন, আলো-বাতাস ও রাস্তা চলাচলে সকলের সমানাধিকার আছে।[১৩]

তাদের আরেকটি দলের নাম 'খুররামিয়া'। এরা বাবেক খুররামীর অনুসারী। এরাই এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দল। এরা কোনো সৃষ্টিকর্তা, আখিরাত, নবুওয়ত, হালাল-হারাম কিছুই মানে না। এদের মাযহাবেরই অনুসারী শাখাসমূহ হলো কারামতী, ইসমাইলিয়া, নাদীরিয়া, কিসানিয়া, যারারিয়া, হেকামিয়া এবং সমস্ত ওবায়দীগণ। যারা নিজেদেরকে 'ফাতেমীয়' বলে অভিহিত করেছে। এদের সবাই মূলতঃ উপরোক্ত একটি মাযহাবেরই অন্তর্ভুক্ত। যদিও ব্যাখ্যায় গিয়ে পৃথক হয়েছে। এদের সকলেরই নেতা, শায়খ ও ইমাম হলো মাজুসীরা। যদিও মাজুসীরা তাদের একটি নিজস্ব দ্বীন ও শরীয়তের

---

[13] আজকের যুগের তথাকথিত সাম্যবাদী ও প্রগতিবাদীদের অনেকেই এই মত পোষণ করে থাকেন।

বিধি-নিষেধের অনুসারী, কিন্তু এরা বিশ্বের কোনো দ্বীন-ধর্ম ও নিয়ম-নীতির ধার ধারে না।

৩৪। নবুওত অস্বীকার করা

যেমন আল্লাহ বলেন-

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ (سورة الأنعام : ٩١)

‘তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি যখন তারা দাবী করে যে, আল্লাহ কোনো মানুষের কাছে কোনো কিছুই নাযিল করেননি। আপনি বলে দিন (হে নবী) মুসা যে গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল তা কে নাযিল করেছে? যার মধ্যে ছিল মানুষের জন্য আলোক ও এবং হিদায়েত। যা তোমরা কাগজের পৃষ্ঠাসমূহে লিপিবদ্ধ করে কিছু অংশ প্রকাশ করো এবং অধিকাংশ গোপন রাখো। তার মধ্যে এমন বস্তু তোমরা জানতে পেরেছ যেসব তোমরা বা তোমাদের বাপ-দাদারা জানতো না। আপনি বলূন, তা আল্লাহই (নাযিল করেছিলেন)

অতঃপর ছেড়ে দিন, ওরা ওদের বাজে তর্কের খেলায় মত্ত থাকুক'। (সূরা আল-আন'আম ৬: আয়াত ৯১)

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই আয়াত ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে অর্থাৎ তোমরা যদি মূসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত নাযিলের বিষয়টি স্বীকার করে থাকো, তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিলকে অস্বীকার করো কেন? কারো মতে এ আয়াত মক্কার মুশরিকদের শানে নাযিল হয়েছিল, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে মানতে রাযী হয়নি। মোটকথা, নবুয়তের অস্বীকার করা জাহেলী রীতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুগে একই রীতির ও ধারণার অনুসারী বহু লোককে পাওয়া যাবে।

৩৫। তাক্বদীরকে অস্বীকার করা

তারা তাক্বদীরকেই কেবল অস্বীকার করতো না, বরং তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে আল্লাহর বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতো এবং তাঁর শরীয়তকে তাকদীরের বিরোধী সাব্যস্ত করতো ও খোঁড়া যুক্তিসমূহ পেশ করতো। এটি শরীয়তের সুক্ষ্ম বিষয়সমূহের অন্যতম এবং এর

তাৎপর্য কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারে যাদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে বুঝবার ক্ষমতা দান করেছেন।[১৪]

জাহেলী যুগের উপরোক্ত ধারণা আল্লাহ বাতিল ঘোষণা করেন এমনিভাবে-

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ (سورة الأنعام : ١٤٨-١٤٩)

'মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা বা আমাদের বাপ-দাদারা মুশরিক হতাম না এবং কোনো কিছুকে হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তী মুশরিকগণ ঐ একই অজুহাতে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অবশেষে তারা আমাদের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেছিল। আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট কোনো সঠিক যুক্তি (ইলম) আছে কি ? থাকলে তা আমাদের কাছে পেশ করো। আসলে

---

[14] এ বিষয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়েমের লিখিত 'শিফাউল আলীল ফিল কাদা ওয়াল কাদরি ওয়াল হিকমাতি ওয়াত তা'লীল' বইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

তোমরা কেবল কল্পনারই অনুসরণ করে থাকো এবং আন্দাজে কথা বলো। আপনি বলে দিন চুড়ান্ত প্রমাণতো কেবল আল্লাহরই, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের সকলকে হিদায়েত করতেন'। (সূরা আল-আনআম ৬: আয়াত ১৪৮-১৪৯)

ব্যাখ্যাঃ "যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা বা আমাদের বাপ-দাদারা মুশরিক হতাম না এবং কোনো কিছুকে হারাম করতাম না।" মুশরিকরা উক্ত কথাগুলোকে তাদের অপকর্মে লিপ্ত হবার যুক্তি হিসাবে পেশ করতো না। কেননা তারা তো এগুলোকে অপকর্ম ভাবতো না, বরং কুরআনের সাক্ষ্য অনুযায়ী তারা এগুলোকে পূণ্য কাজ বলেই ধারণা করতো। আর তারা যে মূর্তিপূজা করতো এটাকে তারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপায় মনে করত। অথচ তা আল্লাহর পক্ষ হতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বুঝা গেল যে, উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা তারা এ কথাই প্রমাণ করতে চায় যে, তারা যা কিছু করছে সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত এবং তিনি এর উপর সন্তুষ্ট। মুতাযিলাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর হুকুমের শামিল এবং এতে তার সন্তুষ্টি অবশ্যই থাকে।

এদের উক্ত দাবীর অসারতায় আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, কথাগুলি সঠিক কিন্তু তার দ্বারা বাতিল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের মিথ্যাচারকে নিন্দা করেছেন এজন্য যে, আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর হওয়ার সঙ্গে নবুওত ও শরীয়ত মান্য করার প্রতি নবীদের দাওয়াত সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, এ দু'টি বস্তু তো মধ্যম পন্থা প্রকাশ করে দেওয়া ও দলীল পৌঁছে দেওয়ার জন্যই।

অনেকের মতে আয়াতে মূলতঃ প্রতিবাদ করা হয়েছে মুশরিকদের এই আক্বীদা বিশ্বাসের যে, তাদের যাবতীয় এখতিয়ার ও ক্ষমতা হরণ করা হয়েছে এবং তাদের আচরণে যে শির্ক প্রকাশ পাচ্ছে তা তাদের বাধ্যতার কারণেই। তারা একথাও ধারণা করে যে, এর দ্বারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যুক্তি দাঁড় করাবে।

মানুষের নিজস্ব কোনো কিছুর এখতিয়ার নেই আল্লাহ তাদের এই ধারণার প্রতিবাদ করেন এবং পূর্ববর্তীদের সংগে তাদের তুলনা করেন, যারা ঐ খোঁড়া যুক্তির দোহাই দিয়ে রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর সংগে শির্কে লিপ্ত হয় এই বিশ্বাস নিয়ে যে, তারা আল্লাহর ইচ্ছাতেই শির্ক করছে। এমনকি উক্ত সন্দেহের বশবর্তী

হয়ে তারা রাসূলদেরকে বিভিন্ন ফালতু যুক্তির মাধ্যমে চুপ করিয়ে দেওয়ার ধারণাও পোষণ করতো।

অতঃপর আল্লাহ একথা পরিষ্কার করে দেন যে, প্রতিটি কাজ তাঁর ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। তবে তিনি ইচ্ছা প্রয়োগ করেন না। যতক্ষণ না তাদের থেকে কোনো কাজ সম্পাদিত হয় (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার অর্থ সম্মতি, বাধ্য করা নয়) অবশ্য যদি তিনি চাইতেন, সকলকেই হিদায়েত দান করতে পারতেন।

(হে পাঠক) যদি আপনি আয়াতটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহলে দেখবেন যে, আয়াতের প্রথমাংশে জাবারিয়াদের[১৫] এবং শেষাংশে মুতাযিলাদের[১৬] যুক্তি খন্ডন করা হয়েছে।

প্রথমাংশে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বান্দার নিজস্ব ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে। সে কারণে তার নাফরমানীর দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

---

[15] যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ইচ্ছা বলে কিছু নেই। বরং যা কিছু হয় কেবল আল্লাহ হতেই হয়। তারা নিজেদেরকে অদৃষ্টের পুতুল মনে করে।

[16] অতি যুক্তিবাদী এ দল কুর'আন ও হাদীসের ঊর্ধ্বে যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়।

শেষাংশে প্রমাণ করা হয়েছে যে বান্দার মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছার প্রয়োগ ঘটে এবং বান্দার সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছার অনুকুলেই হয়ে থাকে (তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই করার ক্ষমতা কারো নেই) এখানে মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নাতগণের[১৭] যুক্তি প্রমাণিত হলো। আলহামদুল্লিাহ।

অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, অবিশ্বাসীগণ নবীদের দাওয়াতকে রদ করতে চেয়েছিল এই যুক্তিতে যে, আল্লাহ আমাদের থেকে শির্ক আশা করেছিলেন বলেই আমরা মুশরিক হয়েছি। অথচ তোমরা আল্লাহর সেই ইচ্ছার বিরোধিতা করে আমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছ।

আল্লাহ তাদের এই অপযুক্তিকে ধিক্কার দিয়েছেন কয়েকটি উপায়ে। যেমন- (১) তোমাদের উপরোক্ত যুক্তিই যদি সত্যিকারের প্রমাণ বলে তোমরা ভেবে থাকো, তবে জেনে রাখো কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই রয়েছে চূড়ান্ত প্রমাণ। (২) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ও তোমাদের বিরোধী সকলকে হিদায়েত দান করতে পারতেন। কিন্তু

---

[17] সুন্নী মুসলিমদেরকে আহলে সুন্নাত বলা হয়। যারা পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর নীতি-নির্দেশকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়। (অনুবাদক)

ইচ্ছার প্রকৃত তাৎপর্য তোমরা যা বুঝেছ, যদি তাই সঠিক হয়, তাহলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে তোমরা খামাখা নিষেধ করো কেন? ওরাতো তোমাদের ধারণাতে আল্লাহর ইচ্ছাকেই কার্যকর করেছে মাত্র। অতএব, তোমাদের ও মুসলিমদের মধ্যে কোনোরূপ শত্রুতা থাকা উচিত নয়। বরং বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। কেননা তোমাদের ধারণা মতে উভয়েই আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করছে। এমনিভাবে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যেমন-

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ (سورة النحل : ٣٥)

'মুশরিকগণ বলে থাকে যে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে আমরা বা আমাদের বাপ-দাদারা তাঁকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করতাম না, তাঁর নিষেধ ব্যতীত কোনো কিছুকে হারাম করতাম না। আসলে তাদের পূর্ববর্তীরা এই একই কাজ করতো। কিন্তু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত রাসূলদের আর কিছুই করণীয় আছে কি'? (সূরা আন-নাহল, ১৬: আয়াত ৩৫)

অত্র আয়াতের মর্ম পূর্বের আয়াতটির মতই। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিয়ে তারা নিশ্চিন্তে নিজেদের অন্যায় অপকর্ম চালিয়ে যেতে চায়। অথচ একথা তারা বুঝতে নারাজ যে, আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু সম্পন্ন হলেও বান্দার প্রত্যেক কাজ-কর্মের প্রতিফল হিসাবে শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা যেহেতু আছে, সেহেতু সব কাজেই তার আংশিক ও সীমিত এখতিয়ার অবশ্যই আছে। নইলে শাস্তি ও পুরস্কার বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। (যা প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত)।

মোটকথা, কোনো বাধ্যতা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয়, বরং প্রকৃত অর্থ দু'য়ের মাঝখানে। অতএব উক্ত রাজত্ব হতে যে ব্যক্তির পদস্খলন ঘটবে, সে ব্যক্তি জাহেলী যুগের লোকদের তরীকার অনুসারী হবে। আল্লাহ যা থেকে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে তাফসীরে রুহুল মাআনীসহ প্রভৃতি তাফসীরে।

৩৬। যামানাকে গালি দেওয়া।

জাহেলী যুগের লোকেরা যামানাকে গালি দিত। যেমন তারা বলতো-

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ (سورة الجاثية : ٢٤)

'দুনিয়ার এই জীবনই সবকিছু। এখানেই আমরা মরি, এখানেই বাচি। কাল বা প্রকৃতিই আমাদেরকে ধ্বংস করে। আসলে এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। তারা কেবল কল্পনা করছে মাত্র। (সূরা আল-জাছিয়া, ৪৫: আয়াত ২৪)

তারা তাদের সমস্ত ঘটনা-দূর্ঘটনাসমূহকে কালচক্রের দিকে সম্পর্কিত করতো। যামানাকে দোষারোপ করে তারা ভুরি ভুরি কবিতাও রচনা করেছে। কিন্তু তারা মোটেই প্রকৃতিবাদী ছিল না। তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতো।

যামানাকে গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বহু হাদীস রয়েছে। যেমন, সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা যামানাকে গালি দিয়ো না। কেননা আল্লাহই যামানা (অর্থাৎ যামানার নিয়ামক)'। এমনিভাবে আবু দাউদ, হাকেম ও বায়হাক্বীতে বিভিন্ন বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায়।

মোটকথা, যারা দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনাসমূহকে আল্লাহ ব্যতীত যামানা প্রভৃতির দিকে সম্পর্কিত করে, তাদের পক্ষে কুরআন-হাদীস কিংবা বিবেকের কোনো সমর্থন নেই।

﴿ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝٤٣ ﴾ [الاسراء: ٤٣]

"আল্লাহ কতইনা পবিত্র মহান, তিনি তাদের এসব কল্পিত কথার বহু ঊর্ধ্বে। (সূরা আল-ইসরা, ১৭: আয়াত ৪৩)

এ সব প্রকৃতিবাদীরা প্রাচীনকালের হোক বা আধুনিক কালের হোক, কট্টর জাহিল ছাড়া এরা কিছুই নয়। এই বাতিল আক্বীদায় বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা আজকের দিনে ভুরি ভুরি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

৩৭। আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা

যেমন আল্লাহ বলেন-

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ . (سورة النحل : ٨٣)

‘তারা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ জ্ঞাত আছে। কিন্তু সেগুলিকে তারা অস্বীকার করে। উহাদের অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী’। (সূরা আন-নাহল, ১৬: আয়াত ৮৩)

এর আগে ৭৮ হতে ৮২ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ মানুষের প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহের বর্ণনা দিয়ে বলেন-

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

(سورة النحل : ٧٨-٨٢)

‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ,

চক্ষু ও হৃদয় দান করেছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। তারা কি লক্ষ্য করে না পাখীকুলের দিকে, যারা আকাশে বিচরণ করে? আল্লাহই ওদেরকে শুন্যে ধরে রাখেন। অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলিকে তোমাদের জন্য আবাসস্থল এবং পশুর চামড়া হতে তোমাদের জন্য তাবুর ব্যবস্থা করেছেন, যাতে ভ্রমণকালে তোমরা তা সহজে বহন করতে পারো। এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পারো। তিনি চুতস্পদ জন্তুসমূহের পশম, লোম ও কেশ হতে তোমাদের কিছু কালের ব্যবহার্য হিসাবে গৃহ সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা, পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান করেছেন, যা তোমাদেরকে উত্তাপ হতে রক্ষা করে। তিনি তোমদেরকে যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য বর্মের ব্যবস্থা করেছেন। এইভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা মুসলিম বা আত্মসমর্পনকারী হও। এরপরেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী, পরিষ্কারভাবে বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত আপনার আর কিছুই করার নেই'। (সূরা আন-নাহল, ১৬: আয়াত ৭৮-৮২)

উপরোক্ত নেয়ামতসমূহকে জেনে শুনেও জাহেলরা অস্বীকার করে থাকে। তারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহর জন্য ইবাদতকে খালেছ করে না। অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, এসব নেয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন। ইবনে জারীর প্রমুখ মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন যে, তাদের অস্বীকারের ধরণ ছিল এই প্রকারের যে, 'আমরা এসব আমাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি'। কেউ কেউ বলতো 'যদি অমুক না থাকতো, তাহলে আমার অমন বিপদ ঘটে যেতো। অথচ 'যদি অমুক না থাকতো তাহলে আমার অমন বিপদ ঘটতো না'। কেউ বলতো 'এটি তাদের দেব-দেবীদের সুপারিশে হয়েছে। কেউ এমনও বলতো যে, আমাদের মধ্যে আল্লাহর নেয়ামত হিসাবে মুহাম্মাদ আছে'। অর্থাৎ তারা সত্যিকারের নবী হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানতো। কিন্তু স্বীকার করতো না।

এখানে ইনকার বা অস্বীকার অর্থাৎ মূল স্রষ্টার দিকে সম্বন্ধ না করে আসবাব বা কার্যকারকসমূহের দিকে সম্পর্কিত করা। তাদের অধিকাংশই অস্বীকারকারী, একথা কয়েকটি কারণে বলা হয়েছে। যেমন- তাদের মধ্যে কেউ কেউ কমবুদ্ধি হওয়ার কারণে হক চিনতে

পারে না। কেউ এমন আছে যারা যুক্তি প্রমাণের দিকে খেয়াল করে না, যদ্বারা উদ্দেশ্য হাছিল সম্ভব হয়। কেউ এমন আছে, শৈশব অবস্থা বা অন্য কারণে যাদের উপর শরীয়তের আদেশ-নিষেধাবলী জারি করার যোগ্য বিবেচিত হয় না। এজন্য সকলকে অস্বীকারকারী না বলে অধিকাংশকে অস্বীকারকারী বলা হয়েছে।

সূরা ওয়াকেয়ার ৮১-৮২ আয়াতে উপরোক্ত মর্ম ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ (سورة الواقعة : ٨١-٨٢)

'তোমরা কি এইসব কথার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করবে এবং সৃষ্টিকেই সবকিছু ধরে নিবে ? অথচ (একথা গুলিকে) মিথ্যা মনে করলে ?

মুসলিম শরীফে ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একবার বৃষ্টি হলে তিনি ইরশাদ করলেন যে, আজ কেউ শুকরগুযার ও কেউ কাফির হিসাবে প্রভাতে উঠেছে। কেননা,

লোকদের কেউ বলেছে, ইহা আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত হিসাবে এসেছে। আবার কেউ বলেছে যে, অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে'।

এই উপলক্ষে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

মোটকথা, নেয়ামতসমূহকে উহার মূল সৃষ্টিকর্তার দিকে সম্বন্ধিত না করাই হলো মূলতঃ আল্লাহকে অস্বীকার করা। বৃষ্টি বা নক্ষত্রের ব্যাপারে আরবদের ধারণা ও এ সম্পর্কে তাদের রচিত বহু কবিতা রয়েছে।

৩৮। আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা

এ বিষয়ে কুরআনে বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরায়ে কাহাফে বলা হয়েছে-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ (سورة الكهف: ١٠٣-١٠٦)

'(হে নবী) আপনি বলুন যে, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সম্পর্কে খবর দিব যারা তাদের সারা জীবনের প্রচেষ্টাসমূহ বরবাদ করেছে? অথচ ভাবতো যে, তারা অতি উত্তম কাজই করছে। এরাই হচ্ছে আল্লাহর আয়াতসমূহকে ও আল্লাহর সাক্ষাতকে অস্বীকারকারী। ফলে তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়েছে। আমরা এদের জন্য কেয়ামতের দিনে দাঁড়িপাল্লা খাঁড়া করবো না। তাদের এই অস্বীকৃতির বদলা একমাত্র জাহান্নাম। কেননা তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল'। (সূরা আল-কাহাফ, ১৮: আয়াত ১০৩-১০৬)

দলীলসমূহ দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের কিছু কিছু অস্বীকার করতো এবং কেউ কেউ পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিত।

প্রিয় পাঠকের নিকট একথা নিশ্চয় গোপন নেই যে, জাহেলী যুগের উপরোক্ত স্বভাবের অধিকারী বরং তার চাইতেও কঠোর প্রকৃতির লোকের বর্তমান যুগে মোটেই অভাব নেই।

৩৯। বাতিল বইপত্র পড়াশুনা করা এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে দূরে নিক্ষেপ করা

আজেবাজে বাতিল বইপত্র ক্রয় করা এবং সেগুলোকে আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর স্থান দেওয়ার জাহেলী যুগের স্বভাব সম্পর্কে সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে-

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ (سورة البقرة : ١٠١-١٠٣)

'যখন কিতাবীদের নিকট তাদের কিতাবসমূহের (তাওরাত ও ইঞ্জীল) সত্যতা জ্ঞাপনকারী আল্লাহর (কিতাবসহ) কোনো রাসূলের আগমন ঘটে, তখন তাদের একদল উক্ত কিতাবকে পিছনে নিক্ষেপ করে। ভাবখানা এই যেন তারা ওসবের কিছুই জানে না। বরং তারা সোলায়মানের আমলে শয়তানরা যা কিছু আবৃত্তি করতো, তারই অনুসরণ করে। সোলায়মান কুফরী করেননি। শয়তানরাই কুফরী করেছিল ও তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। (আর তারা অনুসরণ করতো ঐ সব বস্তুর যা) হারুত ও মারুত (ফেরেশতাদ্বয়ের উপর পরীক্ষামূলক ভাবে) নাযিল করা হয়েছিল। তারা কাউকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার আগে বলতো যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ (এসেছি)। অতএব তোমরা (এসব শিখে) কাফির হয়ো না। (কিন্তু এসব উপেক্ষা করে) তারা ঐ দু'জনের কাছ থেকে ঐসব বিদ্যা শিখে নিত, যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং যে সব বিষয় শিখত যা দ্বারা মানুষের কোনো উপকার নয় বরং ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হয়।

যদিও আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে তারা কারো কোনরূপ ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা রাখে না। ওরা অবশ্যই জানে যে, এসব বাজে বিদ্যার খরিদকারীদের জন্য আখেরাতে কিছুই পাবার নেই। তা কত না নিকৃষ্ট, যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করেছে, যদি তারা জানতো![১৮] (সূরা বাক্বারাহ, ২: আয়াত ১০১-১০২)

এমনিভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ (سورة البقرة : ٧٨-٧٩)

'তাদের মধ্যে এমন কতক মূর্খ আছে, যারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে একটা ভাসা ভাসা ধারণা ছাড়া কিছুই জ্ঞান রাখে না। অতএব ধ্বংস ঐসব লোকদের জন্য, যারা সামান্য অর্থ উপার্জনের (হীন স্বার্থ

[18] মিথ্যা হাদীস ও বাজে কেচ্ছা কাহিনী ভর্তি করে যারা তথাকথিত ধর্মীয় কিতাবপত্র লিখে প্রচার করেন, তারা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। (অনুবাদক)।

হাসিলের) জন্য নিজেরা কিতাব লিখে আল্লাহর কিতাব বলে চালিয়ে দেয়। ধ্বংস তাদের লেখনীর এবং ধ্বংস তাদের উপার্জনের'! (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: আয়াত ৭৮-৭৯)

এই আয়াতটি ইয়াহূদী পীর-পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীকে তাদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক মনে করে রাসূলের গুণাবলী পরিবর্তন করতঃ মনগড়া কিতাবাদী লিখে আল্লাহর কিতাব বলে প্রচার করতো।[১৯]

৪০। আল্লাহর পরিকল্পনাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা

জাহেলী যুগের লোকেরা আল্লাহর সৃষ্টি-পরিকল্পনা ও তাঁর আদেশ নিষেধাবলীর মধ্যে কোনো হিকমত বা দূরদর্শিতা নেই বলে মনে করতো। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন-

[19] জানা আবশ্যক যে, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত কোন নির্দিষ্ট সময় উপলক্ষে নাযিল হলেও তার হুকুম সকল যুগে সকলের জন্য প্রযোজ্য। (অনুবাদক)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ (سورة ص : ٢٧)

'আসমান-যমীন ও তন্মধ্যস্থিত কোনো কিছুকেই আমি নিষ্ফল সৃষ্টি করি নাই। যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই। যারা কুফরী করে তাদের জন্য ধ্বংস, ওরা জাহান্নামী'। (সূরা ছাদ, ৩৮: আয়াত ২৭)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ (سورة الدخان : ٣٩-٤٠)

'আমি আসমান যমীন ও তন্মধ্যস্থিত কোনো বস্তুকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই। আমি যথার্থ কারণেই এগুলিকে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না'। (সূরা আদ-দুখান, ৪৪: আয়াত ৩৮-৩৯)

এতদ্ব্যতীত আরও বহু আয়াত রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো বস্তুকেই বিনা হিকমতে ও বিনা কারণে সৃষ্টি করেনি। অথচ জাহেলী যুগের বাতিল পন্থীদের ধারণা ছিল তাই এবং এ যুগে এরূপ ধারণা অনেকেই করে থাকে।

বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। মুসলিমদের মধ্যে অনেকগুলি ফিরকা এ নিয়ে আপোষে বহু ঝগড়া করেছে। তবে সত্য পথ সেটাই যার উপর উম্মতের প্রথম যুগের মনীষীগণ বা সালাফে ছালেহীনগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁরা আল্লাহর প্রতিটি কার্যে হিকমত ও কারণে বিশ্বাসী ছিলেন। হাফেজ ইবনূল কাইয়্যেম রহ. তাঁর-

شفعاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل

নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। সেখানে তিনি আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টি ও আদেশ- নিষেধের পিছনে যে হিকমত, কল্যাণ ও ফলাফলসমূহ নিহিত রয়েছে, বিভিন্ন অধ্যায় রচনার মাধ্যমে তা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।[২০]

মুসলিমদের মধ্যে ঐ সমস্ত মাযহাবসমূহের মতে আল্লাহর সৃষ্টি ও হুকুমের মধ্যে বান্দার জন্য কোনরূপ দয়া, কল্যাণ বা হিকমত নেই। তাদের ধারণামতে নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও আল্লাহ শাস্তি দিতে পারেন এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে তিনি সওয়াব দান করতে পারেন। আরও

[20] এখানে লেখক আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর কিছু নমুনা উল্লেখ করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তা বাদ দেওয়া হলো।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই সব মাযহাবের নেতাদের অনেকেই আল্লাহকে তাঁর গুণাবলী থেকে পাক মনে করেন।

তাদের ধারণায় আল্লাহর সত্ত্বার সংগে কোনো গুণ সংযোগ করার অর্থ তাঁকে 'দেহবিশিষ্ট' (তাজসীম) ও বান্দার সঙ্গে সাদৃশ (তাশবীহ) সাব্যস্ত করা। তারা মনে করেন যে, আল্লাহকে গুণহীন সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত তাওহীদে বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যেমন- তারা মনে করেন যে, আরশের উপর আল্লাহর আরোহন, আকাশের উপরে আরশের অবস্থান, (তাঁর কথা বলা ও বান্দার) মূসার আলাইহিস সালাম সাথে কথোপকথন এবং অন্যান্য গুণাবলীকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কারো তাওহীদে বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. এর আলোচনার সার সংক্ষেপ উপরে কিছুটা বর্ণনা করা হলো। পূর্ণ আলোচনার জন্য উপরোক্ত কিতাব দ্রষ্টব্য।

৪১। ফেরেশতা ও রাসূলগণকে অস্বীকার ও তাঁদের মধ্যে ঈমানের ক্ষেত্রে তারতম্য করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ . (سورة البقرة : ٨٧)

'নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। মরিয়ম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং তাকে পবিত্র 'আত্মা' দ্বারা শক্তিশালী করেছি। তবে আসল কথা হলো এই যে, যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এমন কিছু নিয়ে আসেন যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। ফলে অনেক নবীকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ ও অনেক নবীকে হত্যা করেছ'। (সূরা আল- বাক্বারাহ, ২: আয়াত ৮৭)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ . (سورة البقرة : ٨٨)

'তারা বলতো যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত। (তা বাজে কথা) বরং সত্য প্রত্যাখানের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।

তাদের খুব অল্প সংখ্যকই ঈমান এনেছে'। (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: আয়াত ৮৮)

সূরা আল-বাক্বারার ৯৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন-

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ . (سورة البقرة : ٩٨)

"যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিব্রীল ও মিকাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু।" (সূরা আল-বাকারা : ৯৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, ইয়াহূদী ও নাছারাদের কেউ কেউ মালাইকা ও রাসূলগণকে অস্বীকার করতো এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করতো। অর্থাৎ তাদের কারও উপরে ঈমান আনতো ও কাউকে অবিশ্বাস করতো। এজন্যেই মুসলিমদেরকে আল্লাহ এ ধরণের পার্থক্য করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ আলা বলেন-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. (سورة البقرة : ٢٨٥)

'স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ বস্তুর (অহী) উপর রাসূল ও মুমিনগণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর। (এবং তারা বলেন যে,) আমরা আল্লাহর রাসূলগণের কোনরূপ তারতম্য করি না। তারা বলে যে, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো। কেননা প্রত্যাবর্তন তো কেবল তোমারই নিকটেই। (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: আয়াত ২৮৫)

৪২। নবী ও রাসূলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা

আল্লাহ বলেন-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ

وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا . (سورة النساء : ١٧١)

‘হে কিতাবীগণ (ইয়াহূদী ও নাছারা), তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলো না। মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কলেমা ও আদেশ মাত্র- যা তিনি মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং বলো না যে, আল্লাহ ‘তিন’। (এমন বলা হতে) বিরত হও, তোমাদের কল্যাণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র উপাস্য। ‘তাঁর সন্তান হবে’ এসব বিষয় হতে তিনি পবিত্র। (সূরা আন-নিসা, ৪: আয়াত ১৭১)

সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যখন এতবড় মহাপাপ, তখনসৃষ্টির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা কত বড় অন্যায়। যেমন মূর্তি পূজা, অলী আওলিয়ার পূজা প্রভৃতি করা হয়ে থাকে। নূহ আলাইহিস সালামের কওম যেমন নাসর, সোআ, ইয়াগুছ প্রভৃতির এবং খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের পূজা করে থাকে। লোকেরা আল্লাহর উপরে এমনি ধরণের আরও বহু অসত্যারোপ করে থাকে।

৪৩। না জেনে ঝগড়া করা

বিভিন্ন ধরণের বেদআত ও কুসংস্কারে লিপ্ত অজ্ঞ জনসাধারণকে যখন কোনো বিজ্ঞ হকপন্থী আলেম ঐ সকল শরীয়ত বিরোধী কাজকর্ম হতে বিরত থাকতে বলেন, তখন জাহেল লোকেরা জিদের বশবর্তী হয়ে তাদের সংগে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এটা নিঃসন্দেহে জাহেলী যুগের একটি রীতি। আল্লাহ আমাদেরকে এ বদ অভ্যাস থেকে নিষেধ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ (سورة آل عمران: ٦٥-٦٦)

‘হে কিতাবীগণ, ইব্রাহীম (ইয়াহূদী ছিলেন, না নাছারা ছিলেন সে) সম্পর্কে তোমরা অযথা কেন তর্ক কর। অথচ আসল অবস্থা এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল তাঁর পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছিল। তোমরা কি

কিছুই বুঝ না? দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরা ঝগড়া করে থাকো। এখন যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তোমরা কেন অহেতুক ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছ। আল্লাহ সব জানেন, তোমরা কিছু জানো না। (সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ৬৫-৬৬)

ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর রহ. ইবনে আব্বাস রা. এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, নাজরানের খৃষ্টান ও ইয়াহূদী পুরোহিতগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জমায়েত হয়ে আপোষে তর্ক শুরু করলো। ইয়াহূদী পুরোহিতরা বলল যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ইয়াহূদী ছিলেন। অপর পক্ষে খৃষ্টানরা বলল যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম খৃষ্টান ছিলেন। আল্লাহ তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

৪৪। দ্বীনের ব্যাপারে না জেনেশুনে কথা বলা

জাহেলী যুগের আরবরা এবং ইয়াহূদী-খৃষ্টানরা দ্বীনের নামে এমন বহু কিছু চালু করেছিল যা করবার হুকুম আল্লাহ তাদেরকে দেননি।

আরবদের অধিকাংশই ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের দ্বীনের অনুসারী ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে আমর ইবন লুহাই (খুযা'ঈ) নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলো। সে দ্বীনে ইব্রাহীমের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটালো। অনেক রকমের বেদআত চালু করলো এবং লোকদেরকে মূর্তি পূজায় প্ররোচিত করলো। এতদ্ব্যতীত উটের কান কেটে ছেড়ে দেওয়া, আরোহনের অযোগ্য ঘোষণা করে ষাড় ছেড়ে দেওয়া, ভাগ্যের তীর বন্টন করা প্রভৃতি অন্যান্য 'বেশরা' কাজে তাদেরকে লিপ্ত করালো। সূরা আন'আমে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

অতঃপর জাহেলী ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা তাদের পীর পুরোহিতগণকে এবং ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রভূর আসনে বসিয়েছিল। এইসব সাধু সন্যাসীগণ রকমারী বেদআতসমূহ চালু করেছিল। ইচ্ছামত হালাল-হারাম নির্ধারণ করেছিল। লোকেরা তাদের ফতওয়া গ্রহণ করলো এবং এ সবের অনুসরণ করতে লাগলো। যদিও দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অহীর উপর নির্ভরশীল। তা কখনোই লোকদের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীর অনুসারী হতে পারে না। অতএব প্রত্যেক বস্তু যার উপর কিতাব ও সুন্নাতের কোনো দলীল নেই, সেটা তার

প্রচলন ও অনুসরণকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। ইয়াহূদীদের এই বদ-স্বভাবের নিন্দা করে আল্লাহ বলেন-

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿سورة آل عمران : ٧٨﴾

'তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা (নিজেদের লিখিত) কিতাবকে জিহবা দ্বারা বিকৃত ভাবে পাঠ করে, যাতে তোমরা (তাকে) আল্লাহর কিতাব বলে মনে করো। কিন্তু আসলে তা (আল্লাহর) কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে যে, তা আল্লাহর নিকট হতে। অথচ তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।" (সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ৭৮)

যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহকে নিজেদের চাহিদা ও খেয়াল খুশীর পক্ষে ব্যাখ্যা দানে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি অবশ্যই উপরোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী জিহবা বিকৃতকারীদের দলভুক্ত হবে। জ্ঞানী পাঠকদের অবশ্যই জানা আছে, যে বর্তমান যুগে রচিত ধর্মীয় পুস্তকাদির মধ্যে এই ধরণের অসংখ্য মাসায়েল স্থান লাভ

করেছে, শরীয়তের যার কোনো ভিত্তি নেই। বাতিলের ব্যাপক হামলা ও হকের অস্পষ্টতা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

৪৫। কিয়ামতকে অস্বীকার করা

তারা পরকালকে অস্বীকার করতো এবং পরকালে আল্লাহর সঙ্গে দীদার, সকলের পুনর্জীবন লাভ ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে নবীদের বর্ণিত বিবরণসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ (سورة الكهف: ١٠٤-١٠٥)

(হে নবী) “আপনি বলুন যে, আমি কি তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সম্পর্কে বলবো যারা তাদের সারা জীবনের প্রচেষ্টাকে বরবাদ করেছে ? অথচ ধারণা করে নিয়েছে যে, তারা খুবই নেকীর কাজ করেছে। ঐসব লোকেরা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সহিত

দীদারকে অস্বীকার করেছে। তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গেছে। কেয়ামতে তাদের জন্য কোনো ওযন করব না।" (সূরা কাহাফ, ১৮: আয়াত ১০৪-১০৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ (سورة النحل: ٣٨-٣٩)

"লোকেরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, আল্লাহ কখনোই মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থান ঘটাবেন না। হ্যাঁ, আল্লাহর ওয়াদাই যথার্থ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। যারা উক্ত বিষয়ে মতবিরোধ করে তাদেরকে চাক্ষুস দেখিয়ে দেয়ার জন্য এবং কাফিরগণই যে মিথ্যাবাদী সে কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্যই (আমি এটা ঘটাবো)। (সূরা আন-নাহল, ১৬: আয়াত ৩৮-৩৯)

বর্তমানে এই ধরণের জাহেলী আক্বীদার লোকের মোটেই অভাব নেই।

৪৬। আল্লাহ বিচার দিবসের মালিক এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা

তারা আল্লাহকে বিচার দিবসের মালিক হিসাবে বিশ্বাস করতো না বরং 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন' এই আয়াতকে তারা মিথ্যা মনে করতো। এটা সেই মহা বিচারের দিন, যে দিন আল্লাহ প্রতিটি বান্দাকে তার ভাল কাজসমূহের পুরস্কার ও মন্দ কাজসমূহের বদলা দিবেন। বর্তমান যুগে শুধু বিচারকেই নয়, বরং খোদ কেয়ামত দিবস ও জান্নাত-জাহান্নামকেই লোকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে।

৪৭। কেয়ামতের দিনে কোনরূপ বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কাজে লাগবে না- এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা

জাহেলী যুগের লোকেরা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ . (سورة البقرة : ٢٥٤)

'হে বিশ্বাসীগণ। আমি তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করো, সেই চুড়ান্ত দিন আসার পূর্বে যে দিন

আপোষে কোনরূপ বেচাকেনা, বন্ধুত্ব, সুপারিশ কিছুই থাকবে না। (এই সব) সত্য অস্বীকারকারীগণই প্রকৃত যালিম বা সীমা লংঘনকারী। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ২৫৪)

'শাফাআত বা সুপারিশ নাই' এ কথার অর্থ, কেউ কারো জন্য কোনরূপ সুপারিশ করতে পারবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ খুশী হয়ে যাকে অনুমতি দেবেন।

উপরোক্ত তিনটি বিশেষণের উল্লেখ করার কারণ, মানুষ সাধারণতঃ উক্ত তিন উপায়েই পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে। এখানে ইশারা করা হয়েছে যে, কোনো প্রকারেই মানুষ মানুষের জন্য কেয়ামতের দিন কোনরূপ সুপারিশ বা সাহায্য করতে পারবে না। না আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে, না বন্ধুর সাহায্যের মাধ্যমে, না কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশের মাধ্যমে। বরং সকল সুযোগই ঐ দিন বন্ধ থাকবে। আল্লাহ ব্যতীত সাহায্য প্রার্থনার স্থল আর কোথাও নেই।

৪৮। শাফা'আতের ভুল অর্থ গ্রহণ করা

তারা সূরা যুখরুফের নিম্নোক্ত আয়াতকেও মিথ্যা ভেবেছিল-

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (سورة الزخرف: ٨٦)

'আল্লাহকে ছেড়ে তারা অন্য যাদেরকে ডাকে, তারা শাফাআতের অধিকার রাখে না। তবে হ্যাঁ, যারা মনে-প্রাণে তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে (তারা ব্যতীত) যদিও তারা একথা নিজেরাও জানে'। (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: আয়াত ৮৬)

তারা যাদেরকে ডাকে, তাদের মধ্যে আছে মালাইকা, ঈসা আলাইহিস সালাম, ওযায়ের আলাইহিস সালাম এবং অন্যান্য অসংখ্য কল্পিত ব্যক্তি যাদেরকে তারা তাদের জন্য শাফাআতকারী বলে মনে করে।

আজকের দিনেও আমরা দেখতে পাই, মূর্তির সামনে লোকেরা দাড়িয়ে থাকে। তাদেরকে ধিক্কার দিলে জওয়াবে বলে এদেরকে তো আমরা মাবুদ বা উপাস্য মানি না বরং শাফাআতকারী মনে করি। কবর পূজারী মুসলিম আর মূর্তি পূজারী অমুসলিম কি একই ধারণায় বিশ্বাসী নয় ?

৪৯। আল্লাহর অলীদেরকে হত্যা করা

আল্লাহর অলীদেরকে হত্যা করা এবং সমাজের ন্যায় বিচারক লোকদেরকে হত্যা করা জাহেলী যুগের অন্যতম বদ-স্বভাব ছিল। আল্লাহ ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে বলেন-

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. (سورة البقرة : ٦١)

'তাদের উপর লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য অর্পিত হলো, বরং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হলো। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। নিরন্তর অবাধ্যতা ও সীমা লংঘনের জন্যই তাদের এই পরিণতি বরণ করতে হলো'। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ৬১)

এমনিভাবে আরও বহু আয়াত রয়েছে যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে অবিশ্বাসী, জাহেল ও সীমা লংঘনকারীদের হাতে নবী রাসূল ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী ও হক্কের দিকে আহবানকারীদেরকে কিভাবে কত রকমের লাঞ্ছনা পোহাতে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, তাদের মর্যাদাবান আলেমগণ মানুষকে হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে এত বেশী দুঃখ-কষ্টের সম্মূখীন হয়েছেন যে, ইতিহাসের পাতা মসীলিপ্ত হয়ে গেছে। তবে সান্ত্বনা এই যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের অনুসারী মু'মিনগণ যদিও প্রথম অবস্থায় দুঃখ বরণ করেছেন, কিন্তু শুভ পরিণতি তাঁদের জন্যই। যেমন আল্লাহ বলেন-

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ . (سورة هود : ٤٩)

'এ সবকিছু গায়েবের খবর আমি তোমার নিকট অহী পাঠিয়েছি, ইতোপূর্বে তুমি বা তোমার কওমের কেউ তা জানতো না। তুমি ধৈর্য্য ধারণ করতে থাকো। কেননা অবশ্যই শেষ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই। (সূরা হুদ ১১: আয়াত ৪৯)।

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাটের দরবারে তাঁর দূত পাঠালেন তখন রোম সম্রাট রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরিত্র জানার জন্য তাঁর দুশমন মুশরিকদের তলব করলেন। জিজ্ঞেস

করলেন, তোমাদের ও তাঁর মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা কি? তারা উত্তরে বলল, অবস্থা পরিবর্তনশীল। হার জিত দু'পক্ষেই হয়ে থাকে। রোম সম্রাট (হিরাক্লিয়াস) বললেন, রাসূলদের অবস্থাই এরকম। তবে শেষ পরিণতি তাদের জন্যই। যেমন বদরের দিন আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্য করলেন। কিন্তু ওহুদের দিন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেললেন। এরপর ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত মুসলিমরা কখনোই পরাজিত হয়নি।

যদি বলা হয় যে, বনী ঈস্রাইলের নবীগণ তাঁদের কওমের হাতে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন, সেকথা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ বিবৃত করেছেন। কিংবা ধার্মিক লোকদের উপর আল্লাহ দুষ্ট লোকদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দান করে থাকেন। যেমন- 'বখত নছর' বনী ইস্রাইলদের উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। যেমন কাফির মুশরিকগণ এবং ইয়াহূদী-খৃষ্টানগণ কখনও কখনও মুসলিমদের উপর বিজয় লাভ করে থাকে। উপরে বলা হয়েছে যে, নিহত নবীগণ জিহাদে শহীদ মু'মিনদের মতই। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾ (سورة آل عمران : ١٤٦-١٤٨)

"এমন কত নবী যুদ্ধ করেছেন, যাঁদের সংগে বহু আল্লাহওয়ালা ছিলেন। আল্লাহর পথে তাদের কত বিপর্যয় ঘটেছে কিন্তু তাঁরা হীনবল হননি, দুর্বল হননি, কিংবা নত হননি। আললাহ ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদেরকেই ভালবাসেন। তাদের মুখে কোনো কথা ছিল না কেবল মাত্র একটি দোয়া ছাড়া, প্রভু হে! আমাদের গুনাহ গুলো এবং বাড়াবাড়িসমূহকে তুমি ক্ষমা করো। আমাদের পদ যুগল সুদৃঢ় রাখো এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর তুমি আমাদিগকে সাহায্য করো। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ১৪৬-১৪৮)

আর এটাতো জানা কথা যে, মুসলিমদের মধ্যে যাদের শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য হয়েছে সাধারণভাবে মৃত্যু বরণকারীদের চেয়ে তারা অনেক মর্যাদার অধিকারী। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. (سورة آل عمران : ١٦٩)

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত'। (সূরা আলে ইমরান, ৩: আয়াত ১৬৯)

মুমিনদের প্রতি অবিশ্বাসীদের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. (سورة التوبة : ٥٢)

(হে রাসূল) "আপনি (ওদেরকে) বলে দিন যে, তোমরা আমাদের জন্য শাহাদাত অথবা বিজয় দু'টির যে কোনো একটির জন্য অপেক্ষা করছো। আর আমরা অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ সরাসরি নিজের

পক্ষ থেকে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন, নাকি আমাদের হাত দিয়ে? অতএব তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সংগে প্রতীক্ষায় রইলাম। (সূরা আত-তাওবা ৯: আয়াত ৫২)

অতঃপর যে দ্বীনের জন্য শহীদগণ রক্ত দিলেন, সেই দ্বীন বিজয়ী হলো, যা মু'মিনদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য বহন করে আনলো। এটাই হলো আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যের প্রকৃত তাৎপর্য।

মোটকথা, মৃত্যু যখন হবেই, তখন এমন মৃত্যুবরণ করা উচিত, যার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যশালী হওয়া যায়। এমন মৃত্যু নিশ্চয়ই কারো কামনা করা উচিৎ নয়, যার দ্বারা না দুনিয়াতে কোনো স্থায়ী কল্যাণ লাভ হয়, না আখিরাতে কামিয়াবী হাছিল করা যায়।

মুমিনদের মধ্যে যাঁরা শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা ন্যায় কাজের নির্দেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধকে জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা শাহাদাতকে কামনা করেছিলেন দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য লাভের জন্য। পক্ষান্তরে কাফিরদের মধ্যে যারা নিহত হয়, তারা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিহত হয়। তারা এর দ্বারা নিজেদের বা নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো

কল্যাণ বা সৌভাগ্য কামনা করে না, বরং দুনিয়াতে সকলের অভিশাপগ্রস্ত এবং আখিরাতে নিন্দিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন-

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾ (سورة الدخان : ٢٥-٢٩)

‘এরা ছেড়ে গেছে দুনিয়াতে কতো না বাগ-বাগিচা, নির্ঝরিণী, কৃষিক্ষেতসমূহ, সুরম্য গৃহসমূহ এবং অসংখ্য নেয়াতম - যার মধ্যে তারা আনন্দে বিভোর ছিল। তাঁদের পরবর্তী লোকদের অবস্থাও এমন ছিল। আসমান ও জমিনের কেউ তাদের জন্য সামান্য চোখের পানিও ফেলেনি এবং (মৃত্যু ঘন্টা বাজার পর) তাদেরকে কোনরূপ ফুরসতও দেওয়া হয়নি’। (সূরা আদ-দুখান, ৪৪: আয়াত ২৫-২৯)

পবিত্র কুরআনেই সাক্ষ্য রয়েছে যে, বহু নবী ইতোপূর্বে নিহত হয়েছেন। সংগে নিহত হয়েছিলেন তাঁদের অসংখ্য আল্লাহভীরু অনুসারী। কিন্তু কোনরূপ দুর্বলতা ও হীনতা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং শত্রুপক্ষের জয়লাভের কারণ হিসাবে নিজেদের

ত্রুটিসমূহকে দায়ী করে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার দ্বারা বিভূষিত করেছিলেন। সাধারণ মুমিনদের ঈমানী অবস্থা যখন এই ছিল তখন নবীগণের অবস্থা এর চাইতে কত উচ্চ মানের ছিল, সহজেই তা অনুমেয়।

মুসলিমদের উপর কাফিরদের যেসব সাময়িক বিজয় ঘটেছে, তার কারণ ছিল মুসলিমদের অন্যায় আচরণ। যেমন ওহুদের যুদ্ধে ঘটেছিল। যদি তারা তাওবা করে তাহলে কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করে, যেমন অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধসমূহে ঘটেছে। এটা নবুওতের নিদর্শন। মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য বিজয় লাভের মূল কথা হলো রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ বা ইত্তেবা। কেননা আল্লাহ চান তাঁর কালেমাকে বুলন্দ করতে এবং তিনি চান তাঁর বিজয়ীদের উপর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসারীদের বিজয় দান করতে।

বনি ইসরাইলদের উপরে বখত নছরের বিজয়ের মূল কারণ ছিল এটাই যে, বনী ইসরাইলগণ মূছা আলাইহিস সালাম অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছিল। অতএব তার শাস্তিস্বরূপ তাদের এই পরাজয় বরণ করতে

হয়েছে। যদি তারা মূসা আলাইহিস সালামের অনুসরণে অটল থাকতো, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পেত, যেমন- দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিস সালামের সময়ে তারা পেয়েছিলেন।

সুরা আল-ইসরা ৪-৮ আয়াতে উক্ত বিষয়ে আল্লাহ বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। মোটকথা, শত্রুপক্ষের, উপর বনী ঈস্রাইলদের বিজয় ও কখনো বণী ঈস্রাইলদের উপর শত্রুপক্ষের বিজয়, মূসা আলাইহিস সালামের নবুওতের নিদর্শন। যেমন মুসলিমদের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনা শেষ নবীর নবুওতের সত্যতার নিদর্শন। বিজয়ীদের উপর বিজয় লাভের এই ধারা মূসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে ও ঈসা আলাইহিস সালাম প্রমুখের সময়ে যেমন চালু ছিল, আমাদের নবীর জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তেমনি চালু ছিল।

পক্ষান্তরে মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের মাঝে বিজয় লাভের দ্বারা মূলতঃ এটাই বলতে চায় যে, আমরা তোমাদের উপর জয়লাভ করেছি তোমাদের পাপের কারণে। নইলে তোমরা যদি তোমাদের দ্বীনের যথার্থ অনুসারী হতে তাহলে কখনোই আমরা জয়ী হতে পারতাম না। বলাবাহুল্য, জয়লাভ সত্বেও শুভ পরিণতি তাদের জন্য

নয়। বরং আল্লাহ যালিমকে যালিম দ্বারাই ধ্বংস করে থাকেন। এমনি করে একদিন সমস্ত যালিমই ধ্বংস হয়ে যাবে। উপরন্তু এই নিহত যালিমরা মৃত্যুর পরে কিছুই সৌভাগ্য কামনা করতে পারে না। কতই না করুণ এদের অবস্থা।

অতএব ইয়াহূদী খৃষ্টানদেরদের উপর মুসলিমদের বিজয় ইতোপূর্বে তাদের উপর বখত নছরের বিজয়ের মত নয়। যেমন- আহলে কিতাবদের অনেকে বলে থাকে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা আমাদের উপর জয়লাভ করেছে আমাদের পাপের কারণে। আসলে আমাদের দ্বীন অত্যন্ত সঠিক ও নির্ভেজাল।

ইহা মূলতঃ একটি বাজে ধারণা। কেননা বখত নছর নবুওতের দাবী করেনি। সে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেনি। সে ইয়াহূদীদেরকে মুসা আলাইহিস সালামের ধর্ম ত্যাগ করে তার ধর্মে আসতে বলেনি। বরং তার এই হামলা ছিল লুটেরা ও ডাকাতের হামলার ন্যায়। এটা কখনোই সেই মহানবীর জয়লাভের মত নয়, যিনি নবুওতের দাবী করেছেন। মানুষকে সেই দাবী মেনে নেবার আহবান জানিয়েছেন। তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের পথ বাতলে দিয়েছেন।

সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন এবং দ্বীন বিজয় লাভ করেছে। সংগে সংগে তাঁর বিরোধীরা পর্যুদস্ত হয়েছে।

মোটকথা, অবিশ্বাসীদের উপর বিশ্বাসীদের বিজয় চিরন্তন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ (سورة الفتح : ٢٢-٢٣)

'যদি অবিশ্বাসীরা তোমাদের সংগে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তাহলে অবশ্যই তারা পিছু হটবে। অতঃপর তারা কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারী কিছুই পাবে না। আল্লাহর এই নির্ধারিত নিয়ম বিগত দিন থেকে চলে আসছে। তুমি কখনোই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখবে না।' (সূরা আল-ফাতাহ্ ৪৮: আয়াত ২২-২৩)

কিন্তু উপরোক্ত বিজয় লাভের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত হলো ঈমান সঠিক হওয়া, যা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত সম্ভব নয়।

যখন বিভিন্ন পাপের কারণে ঈমান ত্রুটিপূর্ণ হবে তখন তার প্রতিফলও তেমনি হবে। যেমন- উহুদের যুদ্ধে হয়েছিল।

আবু হোরায়রা রা. হতে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ যালিমদেরকেই ঢিল দিয়ে থাকেন। তারপর যখন ধরেন আর কোনো মতেই রেহাই দেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ . (سورة هود : ١٠٢)

‘কোন যালিম জনপদকে যখন আল্লাহ তা‘আলা পাকড়াও করেন, তখন এমনিভাবেই পাকড়াও করে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন মর্মন্তুদ’। (সূরা হুদ ১১: আয়াত ১০২)

অতএব মিথ্যাবাদী কদাচারী যারা, তাদের ধন-দৌলত যতই বেশী থাকুক না কেন, তাদের সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সমাজে বেঁচে থাকবে কেবল তাদের বদনাম ও নিন্দাবাদ। এরা যেমন তাড়াতাড়ি উঠে, তেমনি তাড়াতাড়ি এদের পতন হয়। যেমন- (মিথ্যা নবীর

দাবীদার) আসওয়াদ আনাসী, মুসায়লামা কাযযাব, হারেছ দামেস্কী, বাবক খরমী প্রমুখ।

পক্ষান্তরে নবীগণের জীবনে বহু বিপদ-মুসীবত এসেছে শুধুমাত্র তাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য। কেননা আল্লাহ পরীক্ষার মাধ্যমেই তাঁর বান্দাদেরকে মযবুত ও খাঁটি করে দেন এবং চারা গাছের মত ক্রমেই তাঁর ঈমানকে বিকশিত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا . (سورة الفتح : ٢٩)

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের উপর কঠোর, কিন্তু নিজেরা পরস্পরে সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য (প্রায়ই) রুকু-সিজদায় রত দেখবে। তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন দেখতে পাবে। তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের করা এরূপ দেয়া হয়েছে,

যেমন- একটি চারাগাছ, প্রথমে তার অংকুরোদগম হয়, তারপর ক্রমে তা শক্তি সঞ্চয় করে ও শক্ত হয় এবং এক সময় নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। চাষী এতে অত্যন্ত খুশী হয় যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন'। (সূরা আল-ফাতহ, ৪৮: আয়াত ২৯)

উপরোক্ত উদাহরণ এজন্য যে, নবীদের অনুসারী প্রথম দিকে তারাই হয়ে থাকে যারা সমাজের দুর্বল শ্রেণী। পরে ক্রমে তারা শক্তি সঞ্চয় করে থাকেন ও বিজয় লাভে ধন্য হন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের লক্ষ্য করে বলেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ . (سورة البقرة : ٢١٤)

'তোমরা কি এত সহজেই জান্নাতে যাবে বলে ভেবে নিয়েছো? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত কঠিন দুঃখ-কষ্ট-ক্লেশ ও ভুমিকম্প সদৃশ বিপদাপদসমূহের কিছুই তোমাদের কাছে আসেনি? যার ফলে রাসুল

ও তাঁর সংগীরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ‘কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে’। জেনে রাখো, আল্লাহ সাহায্য অতীব নিকটবর্তী’। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ২১৪)

উপরের বিস্তারিত আলোচনায় একথা প্রমাণিত হলো যে, হকপন্থী ও তাদের সাহায্যকারীদের যুলুম করা জাহেলী যুগের রীতি, যা এ যুগেও চলছে।

৫০। জিবত ও তাগুতের উপর ঈমান

‘জিবত’ প্রতিমার নাম। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ ব্যতীত সকল মা’বুদকেই বুঝানো হয়। ‘তাগুত’ অর্থ সকল ধরণের বাতিল। চাই সে মা’বুদ হোক বা অন্য কিছু। এ দু’টির উপরে ঈমান আনার অর্থ দু’ধরণের হতে পারে। দু’টিকেই প্রকৃত অর্থে মা’বুদ বা উপাস্য বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর ইবাদতে তাদেরকে শরীক করা। দুই-উক্ত ‘জিবত’ ও ‘তাগুত’ প্রসূত সকল প্রকারের বাতিল মতাদর্শের অনুসরণ করা। তবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিক সংগত। এজন্য যে, তারা আল্লাহর সংগে উক্ত দুই বস্তুকে শরীক করতো এবং সিজদা করতো।

প্রতিমা ও তাগুতের উপর ঈমান আনা এবং মুসলিমদের উপর মুশরিকদের প্রাধান্য দেওয়া জাহেলী যুগের অন্যতম রীতি ছিল। আল্লাহ ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا . (سورة النساء : ٥١)

আপনি কি লক্ষ্য করেননি এসব লোকদের দিকে? যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে (অর্থাৎ তাওরাত) তারা (আল্লাহকে মানার দাবী করা সত্ত্বেও) জিবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং কাফিরদেরকে বলছে যে, তোমরা মুমিন-মুসলিমদের চাইতে অধিকতর সৎপথ প্রাপ্ত। (সূরা আন-নিসা, ৪: আয়াত ৫১)

উপরোক্ত আয়াতটির শানে নুযূলঃ ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর পূনরায় রাসূলুল্লাহ সা. এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য কুরাইশদের সংগে আঁতাত করার দুরভিসন্ধি নিয়ে হুয়াই ইবন আখতাব ও কা'আব ইবন আশরাফ নামক দুই ইয়াহূদী নেতা তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি ভংগ করে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয় এবং কুরাইশ নেতা আবু

সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আবু সুফিয়ান তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দান করেন। সঙ্গী অন্যান্য ইয়াহূদীকে কুরাইশদের বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে। তখন মক্কাবাসীরা তাদেরকে প্রশ্ন করে যে, তোমরা কিতাবধারী, মুহাম্মদও কিতাব আনয়নকারী। অতএব তোমরা যে আমাদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে আসোনি, তা আমরা কেমন করে বুঝবো ? অতএব তোমরা যদি আমাদেরকে তোমদের সংগে নিয়ে যুদ্ধে বের হতে চাও, তাহলে এই দু'টি প্রতিমার নিকট সিজদা করো এবং এদের উপর ঈমান আনো। কা'আব তাই-ই করলো। অতঃপর সে মক্কাবাসীকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের মধ্যে ত্রিশজন ও আমাদের ত্রিশজন এসে কাবাঘরের সংগে স্ব-স্ব বুক চেপে ধরে দাঁড়াবে এবং শপথ পড়বে এই বলে যে এই মহিমান্বিত গৃহের মালিকের নামে শপথ করছি যে, আমরা সকলে সর্বশক্তি নিয়ে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। তার প্রস্তাব মতে সবাই তাই করলো। পরিশেষে আবু সুফিয়ান কা'আবকে বলেন যে, আপনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর কিতাব (তাওরাত) পড়ে থাকেন এবং অন্যকে শিখিয়ে থাকেন। আমরা মুর্খ, কিছুই জানি না। আচ্ছা বলুন তো মুহাম্মাদ ও আমাদের মধ্যে কে সঠিক পথে বা সত্যের নিকটবর্তী পথে আছে ? কা'আব বলে- বেশ,

তাহলে আপনাদের ধর্মের ব্যাখ্যা দিন। আবু সুফিয়ান বললেন- আমরা আমাদের সেরা উটগুলিকে হাজীদের জন্য যবেহ করে থাকি, তাদের দুধ পান করাই, মেহমানদারী করি, কয়েদীদের মুক্ত করি, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করি, আমাদের প্রতিপালকের এই গৃহ (কাবাগৃহ) সংস্কার করি ও তাওয়াফ করি এবং সবশেষে আমরা পবিত্র হারামের অধিবাসী।

পক্ষান্তরে মুহাম্মদ তার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আমাদের দ্বীন হলো প্রাচীন ও মুহাম্মদের দ্বীন হলো নূতন। এসব শুনে কা'আব উত্তরে বলল যে, আল্লাহর কসম! তোমরাই মুহাম্মদের চেয়ে অধিকতর হেদায়াতের পথে আছো। বলাবাহুল্য, এ পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

৫১। সত্যের উপরে মিথ্যার আবরণ দেওয়া

আহলে কিতাব ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের দের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

(سورة البقرة : ٧١)

'হে কিতাবধারীগণ! তোমরা সব কিছু জানা সত্বেও কেন সত্য গোপন করছো এবং তার উপর মিথ্যার আবরণ ছড়াচ্ছ ? (সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ৭১)

এখানে ইয়াহূদী-খৃষ্টানদেরদের সত্য গোপন করার চারটি তাৎপর্য হতে পারে। যেমন- একঃ তাওরাত ও ইঞ্জিলের মূল গ্রন্থে রদবদল। দুইঃ তারা মুখে ইসলামকে স্বীকার করে ও মুনাফেকীকে গোপন করে। তিনঃ মুসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনে, কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করে এবং চারঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সত্যতাকে মনে মনে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে মিথ্যা বলে।

৫২। সত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য সাময়িকভাবে তাকে স্বীকার করে নেওয়া

নিজ মাযহাবের উপর গোড়ামী ঠিক রেখে সত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য আহলে কিতাবগণ তাদের লোকদেরকে কিভাবে পরিচালিত করতো, তার পরিচয় মিলবে নিম্নোক্ত আয়াতে-

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ﴿٧٣﴾ (سورة آل عمران : ٧٢-٧٣)

'কিতাবধারীদের একটি দল বলে যে, মুমিনদের উপর যা নাযিল হয়েছে অর্থাৎ কুর'আনের উপরে তোমরা দিনের বেলায় ঈমান প্রদর্শন করো এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান করো, হয়ত বা এতে মুমিনরা পুনরায় ফিরে আসবে। তবে (সাবধান) যারা তোমাদের দ্বীনের অনুসারী (ইয়াহূদী কিংবা খৃষ্টান) তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করবেনা'। (সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ৭২-৭৩)

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হাসান ও সুদ্দী রহ. বলেন, খায়বরের ১২ জন ইয়াহূদী ধর্মনেতা এ বিষয়ে একমত হলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দিনের প্রথমাংশে মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করবে ও শেষের দিকে কুফরী করবে। অতঃপর মুসলিমদের সংগে বলবে আমরা আমাদের ঐশী কিতাবসমূহ দেখেছি ও আমাদের আলিমদের সংগে আলোচনা করেছি। তাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দ্বীনকে মিথ্যা পেয়েছি। এমনিভাবে আমরা করতে থাকলে মুসলিমরা সন্দেহে পড়ে যাবে এবং বলবে

কিতাবধারীরা বেশী বিদ্বান। তারা মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতে বড় আলেম।’ অতএব এইভাবে ক্রমে তারা ইসলাম ত্যাগ করে আমাদের ধর্মে (ইয়াহূদী-নাছারা) চলে আসবে।

৫৩। নবীদের রবের আসন দেওয়া

আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ (سورة آل عمران : ٧٩-٨٠)

‘কোন মানুষের জন্য ইহা শোভন নয় যে, তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে লোকদেরকে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার গোলাম বনে যাও। বরং সে বলবে যে, তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। এজন্য যে, তোমরা লোকদেরকে কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাকো এবং তা অধ্যয়ন করে থাকো। সে তোমাদের এ নির্দেশ ও দিবে না যে, তোমরা মালাইকা

ও নবীদেরকে রব বা প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করো। সে কি তোমাদেরকে মুসলিম হওয়ার পরে পুনরায় কাফির হতে বলবে'? (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৭৯-৮০)

ইবনে ইসহাক স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানবাসী ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মনেতাগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। উত্তরে তারা বলল- ' হে মুহাম্মদ, তুমি কি মনে করো যে, আমরা ইবাদত করবো যেমন খৃষ্টানেরা ঈসা ইবনে মারইয়ামকে করে থাকে? উপস্থিত একজন খৃষ্টান সর্দার এ কথার পুনরুক্তি করে জিজ্ঞেস করলো- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি সত্যিই কি তাই চাও? উত্তরে নবী করিম বলেন, 'আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করছি গায়রুল্লাহর ইবাদত করা হতে এবং অন্যকে এ কাজের হুকুম করা হতে। আল্লাহ এজন্য আমাকে পাঠাননি এবং এজন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দেননি'। এই সময় উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

৫৪। আল্লাহর কিতাবের শব্দসমূহকে স্থানচ্যুত করা

ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ . (سورة النساء : ٤٦)

‘ইয়াহূদীদের জন্য কতক লোক (তাওরাতের) কথাগুলিকে স্থানচ্যুত করে এবং বলে আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম, তুমিও শুনো, না শোনার মত। (সূরা আন-নিসা ৪: আয়াত ৪৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . (سورة آل عمران : ٧٨)

‘তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা কিতাবকে জিহবা দ্বারা এমনভাবে বিকৃত করে পড়ে যেন তোমরা উহাকে যথার্থই আল্লাহর কিতাব বলে ধারণা করো। অথচ তা মোটেই আল্লাহর কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে যে, তা আল্লাহর নিকট হতে, অথচ আসলে তা

নয়। বরং ওরা জেনেশুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে’। (সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ৭৮)

ইয়াহূদীরা তাদের মূল কিতাবে কোনরূপ রদবদল করেছে, নাকি নিজেদের রচিত কিতাবে রদবদল করেছে এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। এ বিষয়ে তাফসীরে রুহুল মা‘আনী এবং শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. প্রণীত ‘আলজাওয়াবুছ ছহীহ,’ নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রযেছে।

বলাবাহুল্য, আজকাল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও কিতাবীদের মত কুরআন ও হাদীসের নিজেদের মন মত তাহরীফ ও তাবীলের ব্যধি ঢুকে পড়েছে। আমাদের এ বিষয়ে কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৫৫। হিদায়েতপ্রাপ্ত লোকদেরকে অভিনব উপাধিসমূহ দ্বারা অভিহিত করা

জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের মাযহাব ত্যাগকারীদেরকে ‘ছাবেয়ী’ বলতো। ছহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসসমূহ হতে জানা যায় যে, তার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে ‘ছাবেয়ী’ বলে ডাকতো। যাতে লোকেরা তাদের চিরাচরিত মাযহাব ছেড়ে চলে না যায়। বর্তমান যুগের মুসলিমদের মধ্যে আপনি এমন লোক বহু পাবেন, যাদেরকে বেদআতপন্থী হওয়ার কারণে লোকেরা ত্যাগ করেছে। অথচ উল্টা হক পন্থীদেরকেই তারা বিভিন্ন অপছন্দনীয় নামে অভিহিত করে থাকে। ইমাম ইবনে কুতাইবা স্বীয় ‘তাবীলু মুখতালাফিল হাদীস’ নামক যুগান্তকারী গ্রন্থে বলেন যে, ‘বিদআত পন্থীরা আহলে হাদীসদেরকে হাশবিয়া, নাবেতা, জাবরিয়া প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। অথচ এ সবই মিথ্যা উপাধি মাত্র। এইসব নামের পশ্চাতে আল্লাহর রাসূলের কোনো সমর্থনই নাই। যেমন- তিনি নিম্নোক্ত নামসমূহ দ্বারা অভিহিত করে তাদেরকে বিভিন্নভাবে লা’নত করেছেন। যেমন- (১) কাদরিয়াদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন- ‘তারা এই উম্মতের (মুসলিম মিল্লাতের) মজুসী বা অগ্নি উপাসক। যদি ওরা পীড়িত হয় তবে সেবা করো না, যদি মারা যায় জানাযায় শরীক হয়োনা’ (২) রাফেযী সম্পর্কে-শেষ যামানায় রাফেযী বলে একটি দল হবে, যারা ইসলামকে ত্যাগ করবে এবং দূরে নিক্ষেপ করবে। তোমরা ওদেরকে হত্যা করো। কেননা ওরা মুশরিক। (৩) মুর্জিয়া সম্পর্কে- ‘আমার উম্মতের মধ্যে দু’টি দল হবে যারা আমার শাফায়াত পাবে না, যারা

সত্তর জন নবী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছে। তারা হলো মুর্জিয়া ও কাদরিয়া।' (৪) খারেজীদের সম্পর্কে- 'তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে'। যেমন তীর তার ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়'। অন্য বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে 'জাহান্নামবাসীদের কুত্তা' বলেছেন।

'গুনিয়াতুত্ত্বালেবীন' নামক কিতাবে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. বলেন যে, 'বাতেনীরা আহলে হাদীসগণকে হাশবিয়া বলে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল্লাহিল বালেগাহ' এর মধ্যে বলেন যে, এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীরা আহলে হাদীস জামা'আতের উপর অযথা বাড়াবাড়ি করেছে। তারা উল্টা এদেরকে মুজাসসিমা মুশাববিহা বলেছে এবং দোষারোপ করেছে এই যে, 'আহলে হাদীসরা আল্লাহর গুণাগুণের ধরণ না জানা সম্পর্কিত ছদ্ম দাবী করছে মাত্র। তাদের আসল মতবাদ আল্লাহ আকার হওয়ার পক্ষে। অথচ আমার নিকট অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সব অনুপ্রবেশকারীদের এই অযথা বাড়াবাড়ির পিছনে রিওয়ায়াত ও দেরায়াত (হাদীস ও প্রজ্ঞা) কোনদিক দিয়েই কোনো যুক্তি নেই। এরা হিদায়েতের অগ্রপথিক। আহলে হাদীসগণের

বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে মাত্র।' হাফেয ইবনুল কাইয়্যেম রহ. তাঁর 'নূনিয়্যাহ্' বা 'আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া' নামক কিতাবের মধ্যে আলাদা অধ্যায় রচনা করে বেদআতীরা যে প্রথম কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী সালাফী আহলে হাদীস জামাআতকে 'হাশবিয়া' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছে ২০ লাইন কবিতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে তা ফুটিয়ে তুলেছেন।[২১]

আহলে হাদীসগণের বিরুদ্ধে ইহা একটি বিরাট অপবাদ। যদিও এই ধরণের অপবাদ অন্যেরা দেয় না। আজকের দিনেও হকের এ শত্রু যারা, তারা পূর্ববর্তী জাহিলদের তরীকা অনুসরণ করে কুর'আন ও সুন্নাহর অনুসারী এইসব হকপন্থী লোকদেরকে বিভিন্ন খারাপ নামে অভিহিত করে থাকে।

৫৬। আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করা, এবং সত্যের উপর মিথ্যারোপ করা

[21] মাননীয় লেখক মূল বইতে সমস্ত কবিতা নকল করেছেন। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে বাদ দিলাম। (অনুবাদক)

সত্য দ্বীনের বিরোধী যারা তাদের বৈশিষ্ট্যই হলো আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা এবং সত্য দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। যেমন ইয়াহূদী-খৃষ্টানেরা দাবী করে থাকে যে, তারা যার উপরে আছে সেটাই মাত্র সঠিক এবং আল্লাহ তাদেরকে চিরদিন তাই-ই আঁকড়ে ধরে রাখতে বলেছেন; দ্বীন ইসলাম সত্য নয় এবং আল্লাহ তাদেরকে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সব কিছুই তাদের পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণ মাত্র। তারা দলীল-প্রমাণের দিকে দৃষ্টি দেয় না।

বর্তমান বিশ্বের বেদআতীরা তাদের বেদআতগুলিকেই হক মনে করে এবং ভাবে যে, আল্লাহ তাদেরকে এই সব পূণ্য কর্ম (?) করতে নির্দেশ দান করেছেন। পক্ষান্তরে হকপন্থীরা যে সব আমল করে ওসব বাতিল, অসত্য। 'প্রত্যেকেই লায়লী প্রেমের দাবীদার। অথচ লায়লী তাদের কারো নয়।'[২২]

---

[22] وكل يدعي وصلا لليلى ، وليلى لا تقرلهم بذاكا.

৫৭। মূ'মিনদের উপর মিথ্যারোপ করে বলা যে, এরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।

জাহেলী যুগের লোকেরা মুমিনদের বিরুদ্ধে পার্থিব প্রতিপত্তি লাভের জন্য মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করতো। যেমন ফেরাউনের কওম মূসা আলাইহিস সালামের নিকট লা-জওয়াব হওয়ার পরে দূর্বলের চিরন্তন নীতি অনুযায়ী বাপ-দাদার রীতিসমূহের প্রতি অন্ধ গোড়ামী প্রদর্শন করে বলে-তুমি কি আমাদের নিকট আমাদের বাপ-দাদার রীতি-নীতি হতে বিচ্যুত করবার জন্য এসেছ এবং এই দেশে যাতে তোমাদের দু'ভাইয়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় সেজন্য? আমরা তোমাদের উপর বিশ্বাসী নই'।

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. (سورة يونس : ٧٨)

"তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছো যে, আমাদের সরিয়ে দিবে সে পথ হতে যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। আর পৃথিবীতে তোমাদের দু' জনের আধিপত্য

স্থাপিত হয়ে যায়? কিন্তু আমরা তোমাদের দু’ জনকে কখনো মেনে নেবনা।” (সূরা ইউনূস : ৭৮)

এখানে পার্থিব প্রতিপত্তি বলতে বাদশাহী বুঝানো হয়েছে যেমন- মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যাজ্জাজ বলেন, বাদশাহীকে প্রতিপত্তি এজন্যে বলা হয়েছে যে, তাই হলো দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা বড় কাম্য বস্তু। অতএব যখনই কোনো হকপন্থী ব্যক্তি মানুষকে হকের দাওয়াত দেয়, বাতিলপন্থী জাহেলরা অমনি তাদেরকে প্রতিপত্তি লোভী রাজনৈতিক স্বার্থবিরোধী বলে দোষারোপ করে। অথচ একবারও তারা ভেবে দেখে না, এরা কি বলতে চায় এবং তা কতটুকু যুক্তিনির্ভর।

৫৮। মূ‘মিনদের বিরুদ্ধে সমাজে ফাসাদ সৃষ্টির অভিযোগ

মুমিনদেরকে সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করা জাহেলী যুগের একটি রীতি। যেমন- সূরা বাক্কারার ১১ ও ১২ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

“যখন তাদেরকে বলা হয় পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরাইতো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান এরাই (আসলে) অশান্তি সৃষ্টির হোতা। কিন্তু ওরা (নিজেদের দোষ) বুঝতে অপারগ।” (সূরা আল-বাকারা : ১১-১২)

এমনিভাবে একই রীতি চলছে প্রতি যুগে, ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে যাদের অন্তরে বিভিন্ন বেদআতী রেওয়াজ প্রথা ও বিভ্রান্তিসমূহ দানা বেঁধে আছে।

৫৯। মুমিনদের বিরুদ্ধে ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ

জাহেলী যুগের অন্যতম রীতি ছিল যে, তারা যে নীতির উপরে চলতো, সেটাকেই এক মাত্র হক মনে করতো। এর বাইরে সব কিছুকে গুমরাহী ভাবতো। কেউ তাদের ভুল ধরিয়ে হক পথের সন্ধান দিলে উল্টা তাকেই দ্বীন পরিবর্তনকারী ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করতো। যেমন আল্লাহ উদ্ধৃতি করে বলেন-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ . (سورة الغافر :٢٦)

'আমি আশংকা করছি যে, এই ব্যক্তি তোমাদের ধর্মকে পাল্টে দেবে এবং দেশে ফ্যাসাদ ব্যপ্ত করে দেবে।' (সূরা আল-গাফের, ৪০: আয়াত ২৬)

প্রতি যুগেই হকপন্থীদের বিরুদ্ধে বাতিল পন্থীদের এমনি আচরণ চলে আসছে।

৬০। হক পন্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট কুপরামর্শ

যখন বাতিলপন্থীরা যুক্তিতে হেরে যায় তখন তারা অস্ত্রের আশ্রয় নেয় এবং দেশের সরকারকে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। হকপন্থীদের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী চক্রান্তের মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দেয়। আরও বলে, এরা দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে হেয় করছে এবং জনসাধারণকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেমন- ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়ের নেতারা কুমন্ত্রণা দিয়ে বলেছিল-

أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ . (سورة الأعراف : ١٢٧)

‘আপনি কি মূসা ও তার কওমকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য সুযোগ দিবেন’? (সূরা আল-আরাফ, ৭: আয়াত ১২৭)

এ নিয়ম সব যুগেই ছিল, আজও আছে।

৬১। সত্য বিচ্যুতির ফলে দলে দলে বিভক্তি

প্রকৃত সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে জাহেলী যুগের লোকেরা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে অসংখ্য ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের এই অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ . (سورة ق : ٥)

‘আসল কথা হলো, তারা তাদের নিকট আগত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তারা এমন দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আছে।’ (সূরা কাফ, ৫০: আয়াত ৫)

এই দ্বিধা-সংকোচ কয়েক ধরণের ছিল। যেমন-

(ক) কোনো মানুষের নবী হওয়াকে কেউ কেউ অসম্ভব ভাবতো।

(খ) নবুওত কেবল বিরাট প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তিদেরকে দেওয়া যেতে পারে। যেমন তারা প্রকাশ্যে বলেছিল-

لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.

‘দুইটি বড় জনপদের কোনো মহান ব্যক্তির নিকট কেন এই কুরআন নাযিল হলো না?

(গ) কারো ধারণা ছিল- নবুওত আসলে একটা যাদু মাত্র।

(ঘ) কারো ধারণা ছিল, এটি কোনো মন্ত্রতন্ত্র হবে।

সূরা যারিয়াতের ১১ আয়াতে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে বলেন- নিশ্চয়ই তোমরা নানা কথার বেড়াজালে আটকা পড়ে আছো। যেমন- (ক) তোমরা একদিকে বলছো আসমান-যমীন সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে প্রতিমা পূজা করছো। (খ) রাসূল সম্পর্কে তোমরা একবার বলছ পাগল, একবার বলছ জাদুকর। অথচ

বুদ্ধিমান লোক ছাড়া জাদুকর হতে পারে না। (গ) কেয়ামত সম্পর্কে তোমরা বলছ হাশর-নশর কিছুই নেই, পুণরুত্থান মিথ্যা। ওদিকে বলছ, তোমাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলি কেয়ামতের দিবসে আল্লাহর নিকট শাফাআত করবে। এমনি আরো যুক্তি অপযুক্তির জালে আবদ্ধ হয়ে তোমরা পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছ। অথচ সত্য দ্বীন তোমাদের বার বার আহবান জানাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করছ না।

পৌত্তলিক মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা শেষে সূরা আল-আনআমের ১৫৯ আয়াতে আল্লাহ কিতাবধারী ইয়াহূদী-খৃষ্টানদেরদের অবস্থা সম্পর্কে বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورة الأنعام : ١٥٩)

‘যারা দ্বীনের মধ্যে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, আপনি তাদের কোনো ব্যাপারেই নয়। তাদের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।’

আবু দাউদ ও তিরমিযিতে আবু হুরায়রা রা. প্রমূখ রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ইয়াহূদীরা ৭১ উপদলে ও নাছারাগণ ৭২ উপদলে বিভক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকী সবাই জাহান্নামে যাবে।

বলা বাহুল্য ইসলাম আসার পরে বর্তমান যুগের সকল ইয়াহূদী-খৃষ্টানরাই জাহান্নামী দলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সত্য দ্বীন ইসলামের আবির্ভাবের পরে আগেকার সকল দ্বীন আল্লাহ বাতিল ঘোষণা করেছেন।

তিরমিযী, ইবনে জরীর, তাবারানী প্রমুখ বর্ণিত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণনা আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইসলামের মধ্যে ফিরকা সৃষ্টিকারী তারাই, যারা আমার উম্মাতের মধ্যে বেদআতী ও প্রবৃত্তি পূজারী হবে।

মোটকথা, বিভক্তির মূল প্রেরণা আসে জাহেলিয়াত থেকে। নইলে সত্য দ্বীন চাই তা বিগত দিনের মূসা বা ঈসার আলাইহিস সালাম

শরীয়ত হোক, চাই শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত হোক, উহাতে কোনই ইখতেলাফ বা স্ব-বিরোধিতা নেই। যেমন আল্লাহ বলেন-

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . (سورة البقرة : ٢٥٧)

'ঈমানদারদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ, তিনি তাদেরকে অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের অভিভাবক হলো শয়তান। তারা তাদেরকে আলো হতে অন্ধাকারসমূহের দিকে নিয়ে যায়। ওরা দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: আয়াত ২৫৭)

অত্র আয়াতে আল্লাহ 'নূর' (আলো) এক বচন ও 'যুলুমাত' (অন্ধকারসমূহ) কে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। কারণ নূর বা হক চিরদিনই অখন্ড অবিভাজ্য, তা কখনোই বিভক্ত হতে পারে না।

পক্ষান্তরে যার উৎস অসংখ্য, তা সব সময়ই বিভক্ত হয়ে থাকে। কারণ নানা মুনির নানা মত থাকবেই।

অতএব আক্বীদা ও বিশ্বাসে অনৈক্য জাহেলী যুগের রীতি এবং সত্য বিশ্বাসে ঐক্য এটাই ইত্তেবায়ে রাসূলের নীতি। আমাদেরকে সকল অনৈক্য ভুলে সেই নীতিতেই অটল থাকতে হবে।

৬২। নিজেদের লালিত মতবাদকেই হক মনে করে তার উপর আমল বজায় রাখার দাবী

এটা ছিল জাহেলী যুগে ইয়াহূদীদের স্বভাব, যেমন আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة البقرة : ٩١).

আল্লাহর নাযিলকৃত পাক কুরআনের উপর ইয়াহূদীদেরকে ঈমান আনতে বলা হলে তারা বলে ছিল যে, আমরা কেবলমাত্র বিশ্বাস করবো ঐ বস্তুর উপর যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ তাওরাত) এবং তা ব্যতীত সব কিছুকে তারা প্রত্যাখ্যান করবে।

অথচ কুরআনই প্রকৃত হক কিতাব যা তাদের (তাওরাত-ইঞ্জিল) সত্যতা প্রতিপন্ন করে থাকে। (হে নবী) আপনি বলুন যে, ‘তোমরা যদি সত্যিকারের ঈমানদার হও, তাহলে কেন ইতোপূর্বে নবীদেরকে হত্যা করেছিলেন’? (সূরা আল-বাক্কারাহ, ২: আয়াত ৯১)

৬৩। ইবাদতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা

যেমন তারা আশুরা প্রভৃতি দিনে নিজেদের পক্ষ থেকে ইবাদত বানিয়ে নিত।

৬৪। ইবাদতে কমতি করা

যেমন- কুরাইশ বংশের লোকেরা হজ্জের সময় অন্যান্যদের ন্যায় আরাফাতের ময়দানে অবস্থান (উকুফ) না করে মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং নিজেদেরকে ‘হুমুস’ বা কঠিন ধার্মিক বলে দাবী করতো। (বুখারী, মুসলিম আয়েশা রা. হতে)

আল্লাহ তাদের এই ইচ্ছাকৃতভাবে ইবাদতের কমতি বা ত্রুটির প্রতিবাদ করে ইরশাদ করেন-

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (سورة البقرة : ١٩٩)

'অতএব তোমরা প্রত্যাবর্তন করো সেখান হতে যেখান হতে অন্যান্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে থাকে। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ১৯৯)

৬৫। ইবাদতের উদ্দেশ্যে রুচিকর খাদ্য ও সৌন্দর্য ত্যাগ করা

ইবনে আব্বাস রা. প্রমূখ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, বেদুঈনদের বহু লোক এমনকি মেয়েরাও গাধার মুখের মাছি খেদানোর পট্টির মত ছোট একটা পর্দা নিম্নাংগে ঝুলিয়ে নগ্নাবস্থায় কবিতা আওড়িয়ে পবিত্র কাবা তাওয়াফ করতো। কালবী বলেন, হজ্জের মৌসুমে জাহেলী যুগের লোকেরা জান বাঁচানোর মত সামান্য খেত এবং তারা হজ্জের সময় চর্বি খেত না। মুসলিমরা বললেন যে, হজ্জের সম্মান রক্ষায় আমরাই অধিক হকদার। অতএব, আমরাও অনুরূপ করতে চাই (অর্থাৎ ভাল খাদ্যদ্রব্য ও পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করতে চাই।

(আল্লাহ পাক) উপরোক্ত[২৩] বিষয়গুলির দিকে ইংগিত দিয়ে তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন।

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ (سورة الأعراف : ٣١-٣٢)

'হে আদম সন্তানেরা তোমরা সেজদার স্থানসমূহে (আসার সময়) সুন্দর পোষাকসমূহ পরিধান করো। তোমরা খাও, পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (হে নবী!) আপনি বলূন, আল্লাহর দেওয়া সৌন্দর্যসমূহ যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং রুচিকর (বা পুষ্টিকর) খাদ্যসমূহ কে তোমাদের জন্য হারাম করেছে? আপনি বলে দিন যে, এ সবকিছুই পার্থিব জীবনে মুমিনদের উপভোগের জন্য, বিশেষ করে

---

[23] নগ্ন মেয়েরা তাওয়াফের সময় নিম্নোক্ত কবিতা আওড়াতো-

اليوم يبدو بعضه أو كله ، وما بدامنه فلا أحله.

আজরেক দিনে উহার কিছু অংশ বা সম্পূর্ণটাই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। যাই প্রকাশ হোক না কেন আমি উহাকে হালাল করবো না।

কিয়ামতের দিনে। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এইভাবে আমি আয়াতসমূহকে ব্যাখ্যা করে থাকি'। (সূরা আল-আ'রাফ, ৭: আয়াত ৩১-৩২)

৬৬। মুখে শিস দেওয়া ও হাতে তালি দেওয়ার মাধ্যমে ইবাদত করা

জাহেলী যুগের লোকেরা পবিত্র কা'বা ঘরে এসে মুখে শিস দিতো ও দু'হাতে তালি বাজাতো। আর একেই তারা 'সালাত' বা নামাজ বলে অভিহিত করতো। কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তারা শিস দেওয়া ও তালি দেওয়া শুরু করতো, যাতে ছালাতে (নামাজে) একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নারী ও পুরুষ একত্রিত হয়ে হাত ধরাধরি করে উলঙ্গ অবস্থায় কা'বাঘর তাওয়াফ করতো এবং শিস দিতো ও তালি বাজাতো। ইবাদতের নামে ও ছালাতের নামে জাহেলী যুগের লোকদের এই অশিষ্ট আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন-

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. (سورة الأنفال : ٣٥)

‘বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট শিস দেওয়া ও তালি বাজানোই তাদের সালাত (নামাজ) ছিল। অতএব আজকের দিনে তোমাদের সেই কুফরী কর্মের স্বাদ গ্রহণ করো।’ (সূরা আন-আনফাল, ৮: আয়াত ৩৫)

আজকের এ যুগেও কোনো কোন জাহেল মুসলিম মসজিদে যিকির করার নামে শিস দিয়ে থাকে ও তালি বাজিয়ে থাকে। এ সবই যে জাহেলী যুগের তরিকা, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শরীয়তে শয়তানের আওয়াজ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে ইহাই সর্বজন বিদিত।[২৪]

৬৭। আক্বীদা বিশ্বাসে মুনাফেকী

জাহেলী যুগের অনেকে যখন মুসলিমদের নিকট আসতো তখন মুখে ঈমানের দাবী করতো। কিন্তু যখন সেখান থেকে বেরিয়ে যেতো,

---

[24] এখানে শ্রদ্ধেয় লেখক একটি কবিতা নকল করেছেন। এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে সূরা আল-ইসরার ৬৪ আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। যদিও তা সংগতিপূর্ণ নয়। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বাদ দেওয়া হলো।

তখন যে অবিশ্বাস বা কুফরী নিয়ে সে প্রবেশ করেছিল, সেটা সংগে নিয়েই সে নিষ্ক্রান্ত হতো।

৬৮। ভ্রষ্টতার দিকে আহবান

জাহেলী যুগের লোকেরা মানুষকে অজ্ঞতার কারণে ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করতো।

৬৯। জেনেশুনে কুফরীর দিকে আহবান

জাহেলী যুগের লোকেরা সবকিছু জেনেশুনেও মানুষকে কুফরীর দিকে আহবান করতো।

৭০। বড় ধরণের মকরবাজি

যেমন নূহ আলাইহিস সালামের কওম তাদের নবীর সংগে করেছিল। তারা নূহ আলাইহিস সালামের দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন হিলা বা টালবাহানার আশ্রয় নিয়েছিল লোকদেরকে দ্বীন কবুলের সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তাদেরকে বরং প্ররোচিত করেছিল নবীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴿٢٤﴾ (سورة نوح : ٢٢-٢٤)

'তারা বড় বড় ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছিল। তারা লোকদের বলেছিল, তোমরা কোনো অবস্থাতেই তোমাদের উপাস্য আদ, সুআ, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নাসর প্রভৃতি দেব-দেবীকে ছেড়ো না। এইভাবে তারা বহু লোককে বিভ্রান্ত করে।' (সূরা নূহ, ৭১: আয়াত ২২-২৪)

এইসব মকরবাজদের উত্তরসূরী স্বেচ্ছাচারী দুনিয়া পূজারীগণ পরবর্তীকালে যুগে যুগে নবীদের বিরুদ্ধে ও হকের পথে দাওয়াত দানকারীদের বিরুদ্ধে অনুরূপ ধোঁকাবাজিই করে গিয়েছে। এ সব দাজ্জালদের কূটনীতি ও মকরবাজি হতে আল্লাহর নিকট পাহান চাই।[২৫]

৭১। আলেমদের অবস্থা

25

وقد جربتهم فرأيت منهم ، خبائث بالمهيمن نستجير.

আমি তাদেরকে পরখ করে দেখলাম যে, সবাই খবীছ। অতএব আমি মহান প্রভূর শরণাপন্ন হলাম। (অনুবাদক)।

জাহেলী যুগের নেতারা হয় বদকার আলেম হতো, নতুবা মূর্খ আবেদ হতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ ... وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ (سورة البقرة : ٧٥-٧٨)

'তোমরা কি এটাই আকাংখা করছো যে, ওরা সবাই ঈমান আনবে। অথচ বাস্তব অবস্থা হলো এই যে, ওদের মধ্যে এক দল আছে যারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করে, অতঃপর তা হৃদয়ঙ্গম করার পর জেনেবুঝে তার পরিবর্তন সাধন করে। . . .তাদের মধ্যে আর একটা দল আছে যারা মূর্খ। যারা মিথ্যা আশা ব্যতীত আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না। বরং তারা কল্পনা করতেই অভ্যস্ত।' (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: আয়াত ৭৫-৭৮)

উপরোক্ত আয়াতে ইয়াহূদী সমাজের দু'টি সম্প্রদায়ের চরিত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত দলটি হলো ইয়াহূদী আলেমদের। যাদের সাধারণ চরিত্র ছিল এই যে, তারা তাওরাতের আয়াতসমূহ পাঠ করতো বা শুনতো। তারপর নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছামত অপব্যাখ্যা

করতো। এমনকি তারা নিজেদের তৈরী অনেক কথাও তাওরাতে ঢুকিয়ে দিতো। যেমন তাওরাতে শেষ নবীর দৈহিক গঠন সম্পর্কে বর্ণনা আছে যে, তিনি মধ্যম আকৃতির গৌরবর্ণ হবেন, ইয়াহূদী আলেমরা নিজেদের স্বার্থে তার পরিবর্তন করে লিখলো, তিনি হবেন 'দীর্ঘাঙ্গ মেটে রঙের'। এমনিভাবে তারা বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার শাস্তির বিধান সম্বলিত আয়াতকে পরিবর্তন করে তাদের চেহারায় 'কালো রং' দেওয়র বিধান জারি করলো। বুখারীতে এসবের বর্ণনা আছে।

দ্বিতীয় দলটি হলো ঐ সকল মূর্খ মুকাল্লিদ, যারা উপরোক্ত আলেমদের অনুসরণ করতো। যাদের নিজেদের কোনো বিচারশক্তি ছিল না।

জাহেলী যুগের উক্ত রীতি আজকের মুসলিম সমাজে ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করেছে। আজকের আলেমগণ বদ-স্বভাব এবং অলী-দরবেশগণ প্রবৃত্তি পরায়ণতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন এমন কথা বলেন যার কোনো ভিত্তি নেই। শরীয়তের এমন এমন ব্যাখ্যা দেন যে, সম্পর্কে খোদ ইসলামই লজ্জাবোধ করে। সবকিছুর ফয়সালা আল্লাহর হাতে।

৭২। নিজেদেরকেই কেবল আল্লাহর অলী ধারণা করা

মদীনার ইয়াহূদীরা খায়বরের ইয়াহূদীদের নিকট এই মর্মে লিখলো যে, মুহাম্মাদের আনুগত্য ও বিরোধিতার বিষয়ে তোমরা যেটা করবে আমরা সেটাই করবো। জওয়াবে খায়বরের ইয়াহূদীরা লিখলোঃ আমরা আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের সন্তান। আমাদেরই মধ্যে আল্লাহর পুত্র ওযায়ের ও অন্যান্য নবীদের আগমন ঘটেছে। অতএব আরবদের মধ্য হতে কখনই নবী আসতে পারে না। নবী হওয়ার ব্যাপারে মুহাম্মাদের চাইতে আমরাই অধিক হকদার। সুতরাং তার প্রতি আনুগত্যের কোনো প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ তা'আলা তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন-

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ (سورة الجمعة : ٦-٧)

'(হে নবী) আপনি বলে দিন যে, হে ইয়াহূদীগণ যদি দুনিয়ার সমস্ত লোকদের মধ্যে কেবলমাত্র নিজেদেরকেই তোমরা আল্লাহর অলী বা প্রিয় বান্দা হিসাবে ধারণা করে থাকো এবং এই দাবী যদি তোমরা

যথার্থভাবেই করে থাকো তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো। (নিজেদের অবাধ্যতার কারণে) তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন’। (সূরা আল-জুমু‘আ, ৬২: আয়াত ৬-৭)

ইয়াহূদীদের দাবীর অসারতা প্রমাণের জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ চ্যালেঞ্জ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কেননা ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান ও প্রিয় বান্দা বলে দাবী করতো। উপরন্তু বলতো যে, তারাই কেবল জান্নাতের অধিকারী হবে, আর কেউ নয়। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করে বলেন-

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. (سورة البقرة : ١١١)

‘তারা দাবী করতো যে, ইয়াহূদী বা খৃষ্টানরা ব্যতীত কেউই কখনো জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। এটা তাদের আশা মাত্র। আপনি বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের দাবীর সমর্থনে দলীল পেশ করো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো’। (সূরা আল-বাক্বারাহ ৩: আয়াত ১১১)।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীদেরকে উপরোক্ত মৃত্যু কামনার আহবান পেশ করার সময় বলেছিলেন যে, তোমদের কেউই মৃত্যু কামনার কথা মুখে প্রকাশ করতে গেলেই তার থুথু শুকিয়ে যাবে। বস্তুতপক্ষে তাদের কেউই মৃত্যু কামনার কথা বলেনি। কেননা, তারা আসলে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের বাস্তবতায় বিশ্বাসী ছিল। তারা একথাও জানতো যে, তারা মৃত্যু কামনার কথা প্রকাশ করার সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করবে এবং জাহান্নামের খোরাক হবে। এটি ছিল শেষ নবীর অন্যতম মো'জেযা। এ কারণেই ইয়াহূদীরা আল-কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি।

ইয়াহূদীদের ন্যায় ইসলামী ফেরকাগুলির মধ্যেও আজকাল অনুরূপ ধারণার প্রসার লাভ ঘটে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে আল্লাহর অলী বলে দাবী করছে। অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীনভাবে 'নাজী' ফিরকা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে

কেবল তাদের কথাই বলে গেছেন, যারা নবী ও তার সাহাবীদের তরীকার উপরে কায়েম থাকবে’।[২৬]

৭৩। শরীয়ত ত্যাগ করে আল্লাহর মহব্বতের দাবী করা

জাহেলী যুগের এই রীতির বিরুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (سورة البقرة : ٣١)

(হে নবী) আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর মহববতের দাবীদার হয়ে থাকো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তা হলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল ও কৃপানিধাণ’। (সূরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ৩১)

---

[26] লেখক আলোচনার শুরুতেই আয়াত পেশ করেছেন এবং মাঝখানে যেয়ে শানে নুযুল উল্লেখ করেছেন। পাঠকের সহজবোধ্য হওয়ার জন্য শানে নুযূল আগে দিলাম।

শানে নুযূলঃ হাসান রহ. ও ইবনে জুরায়েজ রহ. বলেন যে, রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একদল লোক আল্লাহর মহববতের দাবীর কথা নবীর দরবারে পেশ করলে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

ইবনে আব্বাস রা. হতে যোহাক বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে দাড়িয়েছিলেন। এমতাবস্থায় কুরাইশগণ তাদের প্রতিমাগুলো সাজিয়ে রাখছিল। তারা প্রতিমার দেহে উট পাখীর ডিমের খোসা এবং কানে দুলসমূহ ঝুলিয়ে রাখছিল। অতঃপর তাকে সিজদা করছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন- হে কুরায়েশরা, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের দ্বীনের বিরোধিতা করছ। তাঁরা উভয়ে ইসলামের উপরই কায়েম ছিলেন। তারা তখন উত্তরে বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা আল্লাহর মহব্বতেই এদের পূজা করি, যাতে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। এর পরে এই আয়াত নাযিল হয়।

আবু ছালেহ বর্ণনা করেন যে, যখন ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান ও প্রিয় পাত্র বলে দাবী করে, তখন এই আয়াত নাযিল হয়,

কিন্তু ইয়াহূদীদের সম্মুখে উক্ত আয়াত পেশ করা হলে তারা তা অস্বীকার করে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রা. বর্ণনা করেন যে, নাজরানের খৃষ্টানদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। যখন তারা দাবী করে যে, আমরা ঈসা মসীহকে সম্মান করি, তাকে পূজা করি কেবলমাত্র আল্লাহর মহববতের খাতিরে। তাদের দাবীর প্রতিবাদে আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

মোটকথা, পাপ-পূণ্যের জগাখিঁচুড়ি দিয়ে কেউ আল্লাহর মহব্বতের দাবী করতে পারে না। কবি কত সুন্দরই না বলেছেন-

تعصي الإله وأنت تظهر حبه * هذا لعمري في القياس بديع

لو كان حبك صادقا لأطعته * إن المحب لمن يحب مطيع.

‘তুমি আল্লাহর অবাধ্য আচরণ করবে, অথচ মুখে তার প্রতি মহব্বত প্রকাশ করবে। আমার জীবনের কসম এটি একটি অভিনব যুক্তি।

‘যদি তোমার ভালবাসা খাঁটি হয়, তাহলে অবশ্যই তুমি তার আনুগত্য করবে। নিশ্চয়ই প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের প্রতি অনুগত থাকে।

৭৪। আল্লাহর উপর কাল্পনিক মিথ্যা আশা

ইয়াহূদীরা অনুরূপ আশা পোষণ করতো। এদের একটি ঘটনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়-

الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون. (آل عمران :٢٣-٢٤)

(হে নবী !) "আপনি কি দেখেননি ওদের আচরণ, যাদেরকে আল্লাহর কিতাবসমূহের একটা অংশ (তাওরাত) দেওয়া হয়েছে? ফয়সালার জন্য ওদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হলো। অতঃপর ওদের মধ্যকার একটি দল তা হতে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। (আল্লাহর কিতাবের ফয়সালা হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার দুঃসাহসের পিছনে তাদের যে ধারণা ক্রিয়াশীল ছিল, তা হলো এই যে) তারা বলতো যে, (বাছুর পূজার) মাত্র কয়েকটি দিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাদের এই মিথ্যারোপ তাদেরকে

দ্বীনের ব্যাপারে ধোঁকায় নিক্ষেপ করে।" (সূরা আলে ইমরান : ২৩-২৪)

শানে নুযূলঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ইয়াহূদীদের তাওরাত শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে সমবেত ইয়াহূদীদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন। তখন ইয়াহূদী নেতা নু'মান ইবন আমর ও হারেছ ইবন যায়েদ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কোনো দ্বীনের উপরে আছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 'ইব্রাহীমের দ্বীন ও মিল্লাতের উপরে'। তখন উক্ত দুইজন বলল, ইব্রাহীমতো ইয়াহূদী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'বেশ তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো'। তাওরাতই তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা দিবে। উক্ত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিয়েই উপরোক্ত আয়াত নাযলি হয়।

বাইরের বর্ণনায় জানা যায় যে, ইসলামে রজমের নির্দেশ আসার আগে ইয়াহূদীদের মধ্যে একটি ব্যভিচারের ঘটনা সংঘটিত হয়। ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলা দু'জনেই উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে শাস্তি কিছু হালকা করবার জন্য ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাতায়াত শুরু করলো। রাসূল তাদেরকে বললেন, ‘আমি তোমাদের ধর্মের কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবো। তখন তারা রজমকে অস্বীকার করলে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাত আনতে হুকুম দিলেন। ইয়াহূদী নেতা জুরহুম ইবন ছুরিয়া চতুরতার সংগে রজমের আয়াতটির উপরে হাত রেখে ওটা বাদ দিয়ে পড়ে গেল। তখন নও-মুসলিম প্রাক্তন ইয়াহূদী ধর্মীয় পন্ডিত আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিলেন এবং আয়াতটি প্রকাশ করে দিলেন। অতঃপর তাওরাতের বিধান মতে উক্ত ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা করা হলো। এই ঘটনায় ইয়াহূদীরা ক্রুদ্ধ হয়। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া ফয়সালা ও তাওরাতের মীমাংসার প্রতি অবজ্ঞা করার পিছনে তাদের বিশ্বাস ছিল একটাই যে, জাহান্নামের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাদের ধারণা ছিল এই যে, আমাদের বাপ-দাদারা নবী ছিলেন। তাঁরা আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তার

আওলাদদেরকে আযাব দিবেন না, কেবল কসম লংঘন করা ব্যতীত। আল্লাহ তাদের এই সব ধারণার প্রতিবাদ করেন।

বর্তমান যুগে মুসলিমদের মধ্যেও শাফাআতের ভুল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে এবং অনেকের ধারণা আছে যে, তারা নিজেদের আমল ব্যতীত অমুক হুজুর বা অমুক পীর সাহেবের কিংবা নিজেদের উচ্চ পদমর্যাদার কারণে সুপারিশের জোরে কিয়ামতের দিন পার পেয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।[২৭]

৭৫। নেককার লোকদের কবরগুলিকে মসজিদে পরিণত করা

এই স্বভাব ছিল ইয়াহূদী খৃষ্টানদের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের বিরুদ্ধে লা'নত করে বলেন, 'আল্লাহ ইয়াহূদী ও নাছারাদেরকে অভিশপ্ত করুন, তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।' বুখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[27] লেখক এখানে সূরায়ে বাক্বারাহ ৮১-৮২ আয়াতকে পূনরায় দলীল হিসাবে এনেছেন।

ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের ধংস করুন, যারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এরপর একই মর্মের আরও কতকগুলি ছহীহ হাদীস পেশ করার পর লেখক আরও কতকগুলি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন) যেমন- আয়েশা রা. প্রমুখ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা উম্মে সালমা ও উম্মে হাবীবা রা. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাবাশাতে (ইথিওপিয়া) দেখে আসা মারিয়া নামক একটি ইয়াহূদী গীর্জা সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তারা উক্ত গীর্জার সৌন্দর্য ও তার মধ্যে টাঙানো ছবিসমূহের কথা উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যকার কোনো একজন নেককার লোক যখন মারা যায়, তখন তারা তার কবরে মসজিদ নির্মাণ করে এবং বিভিন্ন ছবিসমূহ সেখানে লটকিয়ে রাখে। এরা আল্লাহর নিকট সৃষ্টিকুলের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব। সুনানে আর বাআ'র অন্য বর্ণনাতে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে-

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. (رواه أهل السنن الأربعة)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে এবং কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ ও বাতি দানকারীদেরকে লা'নত করেছেন।

ইয়াহূদী নাছারাদের অনুকরণে সৎলোকদের কবরে এইভাবে মসজিদ নির্মাণ করাকে প্রকাশ্যভাবেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও একথা সকলেই জানেন যে, বর্তমান মুসলিম সমাজে কবরে মসজিদের সৌধ নির্মাণ করা হোক বা না হোক কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করা যে হারাম এবং সেই হারাম কর্ম সম্পাদনকারী যে স্পষ্ট মালাউন বা অভিশপ্ত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়টির উপর বহু হাদীস ও বর্ণনা রয়েছে এবং সে কারণে সালাফে ছালেহীনগণ উহার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতেন।

৭৬। নবীদের স্মৃতিচিহ্নসমূহে মসজিদ নির্মাণ করা

এ বিষয়টিও ইয়াহূদী খৃষ্টানদেরদের আবিস্কৃত। যেমন- ওমর রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের নবীদের নিদর্শনসমূহকে

মসজিদে পরিণত করতো। এদের অনুকরণে বহু জাহেল মুসলিম এ ধরনের কাজ শুরু করেছে। যেমন তারা সৌধ নির্মাণ করেছে সেই স্থানে, যেখানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মগোপন করেছিলেন। অথবা যেখানে পা রেখেছিলেন, কিংবা যেখানে দাড়িয়ে ইবাদত করেছিলেন। অথচ ইসলামে এইসব অতি ভক্তির কোনো স্থান নেই।

ইরাকে এমন বহু স্থান আছে, যেখানে বড় বড় সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন একটি জায়গা আছে, লোকদের ধারণা সেখানে শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী রহ. ইবাদত করতেন। আর এক জায়গায় একটি পাথরের উপরে হাতের তালুর চিহ্ন আছে। শিয়াদের ধারণায় এটি তাদের ইমাম আলীর রা. হাতের তালূর চিহ্ন। এমনিভাবে আরো কয়েকটি জায়গা আছে, যেসব জায়গা সম্বন্ধে লোকদের ধারণা এই যে, এসব স্থানে খিযির আলাইহিস সালামকে দেখা গিয়েছিল। যদিও তার কোনো ভিত্তি নেই। এমনিভাবে আরো বহু স্থান আছে, যে সবের নাম করতে গেলে স্থান সংকুলান হবে না। অতএব যারা ইসলামের দাবীদার, তাদের উচিত এসব থেকে দূরে থাকা।

বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলে আশা করি অন্যায় হবে না। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ রহ. বলেন যে, উপরোক্ত ব্যাপারে খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের মধ্যে দু'ধরণের মতামত দেখতে পাওয়া যায়। এক - ঐ সমস্ত স্থানে ইবাদত করা নিষিদ্ধ। তবে যেসব স্থান সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ আছে, সেগুলির হুকুম স্বতন্ত্র। যেমন মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায় করা, কাবা ঘরে খুঁটির নিকটে সালাত পাঠ করা, মসজিদসমূহে এবং পয়লা কাতারে ছালাতের আকাংখা করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মত হলো- বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দিয়ে এসব স্থানে ইবাদত করায় তেমন কোনো দোষ নেই। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. আল্লাহর নবীর চলার পথের নিদর্শনসমূহকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। যদিও নবী করীম এসব স্থানে হঠাৎ কখনো চলেছেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে রহ. উক্ত বিষয়ে কেউ জিজ্ঞেস করলে এর সমর্থনে তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. (অন্ধ ছাহাবী) কি নিজ বাড়ীতে সালাত আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাননি? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.কি রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার

পথের নিদর্শনসমূহের অনুগমন করতেন না ? অতএব এসব স্থানে যাতায়াত করায় কারুর জন্য ক্ষতির কারণ নেই। তবে বাড়াবাড়ি করা অন্যায়।

আহমদ ইবনে কাসেম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনিও উপরোক্ত মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, এক সময় ইবনে ওমর রা. কে একস্থানে পানি ঢালতে দেখা গেল। জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, আমি এই স্থানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি ঢালতে দেখেছি। আহমদ রহ. বলতেন যে, এতটুকু করায় কোনো দোষ বর্তায় না। কিন্তু আজকাল লোকেরা এ ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করছে। যেমন- ইমাম হোসাইয়েন রা. এর কবর প্রভৃতি সম্বন্ধে। উপরের আলোচনা দু'টি কিতাবুল আদবের মধ্যে 'খেলাল' বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে মুসা ইবন উকবা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি সালেম ইবন আবদুল্লাহকে রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াতে ও সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি বলতেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবন ওমর রা. এইসব স্থানে রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছালাত আদায় করতে দেখার কারণে নিজেও সালাত

আদায় করতেন। এসব কারণেই ইমাম আহমদ রহ. এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে যারা এটাকে অপছন্দ করেন, তাদের যুক্তি নিম্নরূপঃ

সাঈন ইবন মানছুর স্বীয় সুনানে মারুর ইবন সুওয়াইদ হতে বর্ণনা করেন যে, আমরা একদা ওমরের রা. সংগে হজ্জের সফরে বের হলাম। তিনি আমাদের সংগে ফজরের জামা'আতে প্রথম রাকা'আতে সুরা ফীল ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা কুরাইশ তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর হজ্জ থেকে ফেরার পথে দেখলেন যে, এক জায়গায় সালাত পাঠ করার জন্য লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি কছে। তিনি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, এখানে রাসূলুল্লাহ সালাত আদায় করেছিলেন। একথা শুনে ওমর রা. বলেন, তোমাদের পূর্বে ইয়াহূদী খৃষ্টানরা এভাবেই ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীদের স্মৃতি চিহ্নগুলিকে ইবাদতগাহে পরিণত করেছিল। এতএব তোমাদের মধ্যে যাদের (ফরয) সালাত বাকী আছে, তারা আদয় করে নাও। যাদের সালাতের প্রয়োজন নেই, তারা চলে যাও।

অন্য বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবন আযযাহ প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যে ঐতিহাসিক গাছ তলায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকল মুসলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে হাত রেখে মৃত্যুশপথ নিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যখন লোকেরা ঐ গাছের কাছে যাতায়াত শুরু করলো, তখন ওমর রা. ভবিষ্যৎ ফেৎনার আশংকায় গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

এখানে ওমর রা. যে দুরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উহাই গ্রহণযোগ্য। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল্লাহ ইবন ওমর ব্যতীত সকল ছাহাবীর মতামত উহাই। অতএব তার উপরেই আমাদের আমল করা ওয়াজিব এবং সেদিকেই ফিরে যাওয়া উচিত। গ্রন্থকার মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান আল তামিমী যে একজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কুর'আন ও সুন্নাহপন্থী চিন্তাবিদ ছিলেন এবং হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন না, উপরোক্ত আলোচনা তাঁর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৭৭। কবরে বাতি দেওয়া

ইতোপূর্বে এর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীছ উল্লেখিত হয়েছে। প্রিয়

পাঠক! বিশেষ করে যদি আপনি একবার শিয়া ইমাম বা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারভূক্ত ইমামদের কবরগুলিকে দেখতেন। সেখানে রমযানের রাত্রি ও অন্যান্য পবিত্র রাত্রিগুলিতে যেভাবে আলোকসজ্জা করা হয (তা দারুণভাবে নিন্দনীয়)। অথচ তারা এক অতীব পূণ্যের কাজ বলে ভেবে থাকে।

৭৮। কবরগুলিকে ঈদের স্থানে পরিণত করা

আবু হুরায়রা রা. বলেন-[২৮]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلو بيوتكم قبورا، ولا تجعلو قبري عيدا، وصلوا عليّ، فإن صلوتكم تبلغني حيث كنتم. (رواه النسائي)

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে তোমরা (যিকির-আযকার ও সালাত থেকে খালি করে) তোমাদের ঘরগুলিকে কবরস্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার কবরকে

[28] মাননীয় লেখক হাদীসটি ভুলক্রমে উল্লেখ করেননি। আলোচ্য বিষয়ের সহিত মিল থাকায় সংযোজন করা হল। (অনুবাদক)

ঈদ-উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পড়ো। যে স্থান থেকেই তোমরা দরুদ পড়ো না কেন, তা আমার কাছে পৌঁছানো হয়। (নাসাঈ, মেশকাত ৮৬ পৃঃ)

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন যে, ঈদ বলা হয় ঐ সাধারণ সম্মেলনকে যা প্রতি বছর, সপ্তাহে বা মাসে নিয়মিতভাবে ফিরে আসে বা আবর্তিত হয়। যেমন-ঈদুল ফিতর, জুমু'আ বা অনুরূপ কোনো উপাসনা সম্মেলন অথবা সাধারণ সম্মেলন। কখনো তা নির্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। কখনো বা অনির্দিষ্ট স্থানে।

ইরাকবাসী মুসলিমদের অবস্থা হলো এই যে, তারা দেশের প্রত্যেক অলির কবরে নির্দিষ্ট একটি দিনে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে জমায়েত হবে। (যেমন-আমাদের দেশে 'উরস' উৎসবে জমায়েত হয়ে থাকে । কেউ জুমু'আর দিনকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, কেউ মঙ্গলবার, কেউ বা অন্যান্য সময়ে। এমনিভাবে কোনো কোন রাতকেও তারা (যিয়ারত ও জমায়েতের উদ্দেশ্যে) নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। যেমন- শবে কদর, শবেবরাত বা ঈদের দিনগুলিতে যেসব বিষয়ে আল্লাহ কোনো দলীল নাযিল করেন নি।

৭৯। কবরে যবেহ করা [২৯]

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ (سورة الأنعام : ١٦٢-٦٣)

(হে নবী) ‘আপনি বলুন যে, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছুই কেবলমাত্র বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এ বিষয়ে (কোনরূপ শরীক না করার জন্যই) আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম’। (সূরা আল-আন‘আম, ৬: আয়াত ১৬২-১৬৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ রাববুল আলামীন স্বীয় নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন- মুশরিকদের নিকট একথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে, তিনি স্বীয় ইবাদত উপাসনা ও যবেহ কুরবানীকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই

---

[29] আমাদের দেশে কবরে ‘হাজত’ দেওয়া বলা হয়। (অনুবাদক)

খালেছ করেছন। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য কামনা করবে তার ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য কিংবা তার কাছ থেকে কোনো উপকার লাভের জন্য- তাহলে সেটা হবে সেইরূপ কুফরী ও শিরকী আক্বীদা, যার উপর পূর্ববর্তী লোকেরা ছিল। উহার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসগুলি প্রণিধানযোগ্য।

জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 'বাওয়ানাহ্' নামক স্থানে তার মানতী পশু যবেহ করার অনুমতি চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, সেখানে কি কোনো মুর্তি আছে? তারপর জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কি মুশরিকদের জমায়েতের মত জমায়েত হয়ে থাকে? উত্তরে সেই ব্যক্তি বলেন কোনটাই নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। (আবু দাউদ)

অন্য একটি সহীহ হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলেন যে, দেখো সামান্য একটা মাছির কারণে একজন লোক জাহান্নামে গেল অপরজন জান্নাতে গেল। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সেটা কিরূপ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, দু'জন লোক একটি

সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একটি প্রতিমা ছিল। নিয়ম ছিল এই যে, তার নিকট দিয়ে যে কেউ অতিক্রম করবে, তাকে ঐ প্রতিমার নামে কিছু কুরবানী দিয়ে যেতে হবে। একজন বলল, কুরবানী দেয়ার মত আমার কাছে কিছু নেই। তারা বলল, একটি মাছি ধরে হলেও কুরবানী দাও। তাদের কথা অনুযায়ী প্রথম লোকটি কাজ করলো, একটি মাছি কুরবানী দিল এবং,সে মুক্তি পেল। অতঃপর জাহান্নামী হলো। অন্য জন পরিষ্কার বলে দিল যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কোনো কিছু কুরবানী দিতে প্রস্তুত নই। ফলে লোকেরা তাকে হত্যা করলো। কিন্তু সে জান্নাতী হলো।[৩০]

হাদীসটিতে (আমাদের জন্য) বহু উপদেশ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এখানে লোক দুইটি মুসলিম ছিল। অথচ সামান্য কারণে একজন জাহান্নামে গেল। লোকটির আক্বীদা-বিশ্বাসে কোনো ত্রুটি ছিল না। সে শুধুমাত্র 'জান বাঁচানোর' খাতিরেই কাজটি করেছিল।

---

[30] 'জান বাঁচানো ফরজ' এই গোড়া অজুহাত দেখিয়ে এবং তথাকথিত হেকমতের দোহাই দিয়ে যারা শিরকের সংগে সহঅবস্থানের চেষ্টা করেন, তারা হাদীসটি সম্পর্কে চিন্তা করুন।

প্রিয় পাঠক ! নিয়ত ও আক্বীদা-বিশ্বাসই সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। আক্বীদা কত মজবুত ও আপোষহীন হওয়া প্রয়োজন, উপরের ঘটনাটি তার জ্বাজ্জল্যমান প্রমাণ। অতএব আপনি বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করুন। মনের কান দিয়ে শুনুন, লোকগুলি ঐ দু'জনের নিকট কি প্রস্তাব দিয়েছিল। ভাবো, হৃদয় দিয়ে ভাবো। দেকুন সত্য সব সময়ই স্পষ্ট, আর বাতিল সব সময়ই সন্দেহযুক্ত। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, মুশরিকগণ তাদের প্রতিমাগুলির জন্যে কুরবানী করে থাকে আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে, ওরা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য শাফাআত করবে এই উদ্দেশ্যে। কেননা ওরা কেউ আল্লাহর রাসূল, কেউ মালাইকা, কেউ বা আউলিয়া। আজকালকের মানুষ আরও কত কি করছে, তা আপনার নিকট খুব পরিষ্কার। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন।

৮০। বড় বড় নির্দশনসমূহ দ্বারা বরকত কামনা করা।

কোন মহৎ কাজ বা মহান ব্যক্তি বা বংশের মর্যাদার বড়াই করা কিংবা তা দ্বারা বরকত কামনা করার এ স্বভাব জাহেলী যুগের আরব ও ইয়াহূদী খৃষ্টানদের মধ্যে ছিল। আজকাল মুর্খ মুসলিমদের ধমনীতে

উক্ত বদ-স্বভাব ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ করেছে। বরং ‘আইয়ামে জাহেলিয়াতের চেয়েও বেড়ে গেছে।

একবার হাকীম ইবন হেযাম রা. মুয়অবিয়ার রা. নিকট থেকে একশত দিরহামের বিনিময়ে কিছু উট, ঘোড়া ইত্যাদি (দানীয় বস্তু) ক্রয় করলে জনৈক ব্যক্তি তাকে বললো- ‘আপনি কুরায়েশের মর্যাদা ক্রয় করলেন।’ এ কথার জওয়াবে হাকীম ইবন হেযাম কুরায়শী রা. বললেন- ‘যাবতীয় মর্যাদা চলে গেছে, এখন কেবল তাকওয়া বাকী আছে।’

কেন বলবেন না ? তিনি যে ছিলেন একজন জ্ঞানী, দানশীল, মর্যাদাবান, পরহেযগার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ধনশালী। জাহেলী যুগে তিনি একশত উটের বিনিময়ে অন্যের একশত গোলাম আযাদ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি একশত উটসহ হজ্ব করেছেন। উটগুলিকে তিনি মূল্যবান ইয়ামনী চাদর পরিয়েছিলেন এবং কুরবানী দিয়েছিলেন, আরাফাতের ময়দানে হাজীদের খিদমতের জন্য একশত বালককে নিয়োজিত করেন, যাদের প্রত্যেকের গলায় রূপার বেড়ী ছিল। যাতে লেখা ছিল ‘হাকীম ইবন হেযামের পক্ষ হতে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদকৃত’। তিনি এক হাজার ছাগল কুরবানী

করেন। তিনি কাবা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জাহেলী যুগে ষাট বৎসর ও ইসলামে ষাট বৎসর- মোট একশত বিশ বছর হায়াত পেয়েছিলেন।

৮১। প্রতিপত্তির অহংকার

৮২। বিভিন্ন গ্রহের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা

৮৩। বংশ উল্লেখ করে তিরস্কার করা

৮৪। কারো মৃত্যুর পরে চিৎকার করে কান্না করা

এ চারটি বিষয় একটি হাদীছ দ্বারা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন- বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাতে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মালিক আশআরীকে বলেন, দেখো 'আমার উম্মত জাহেলিয়াতের চারটি বদ স্বভাব ত্যাগ করতে পারবে না'। (১) প্রতিপত্তির অহংকার (২) বংশের নামে তিরস্কার (৩) গ্রহ নক্ষত্রাদির সাহায্যে বৃষ্টি প্রার্থনা ও (৪) কারো মৃত্যুর ফলে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা। এগুলো যে করবে কিয়ামতের দিন

তাকে আলকাতরার পাজামা এবং সারা গায়ে খোস পাঁচড়ার পোষাক পরানো হবে।’

উক্ত হাদীছ দ্বারা জাহেলী যুগের উপরোক্ত রীতিসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলিমদের মধ্যে আজকাল অনেকেই এ সবের অনুকরণ করছে, বরং আরও বেড়ে গেছে এবং সেতারে রাগিনী সংযোগ করেছে। প্রিয় পাঠক! আপনি এসব লোকদেরকে দেখবেন নিজেদের বাপ-দাদার গর্ব করছে। অথচ নিজেরা তাদের চেয়ে অনেক দূরে। কেউ বলবে আমার দাদা ছিলেন অমুক বুযুর্গ। কেউ বলবে আমার দাদা ছিলেন অমুক আলেমী হক্কানী, এমনিতরো আরো কত কিছু। এমনিভাবে বংশের বড়াই করে তারা বলে- অমুকের বাপ-দাদারা পবিত্র বংশের ছিল না, কিংবা অমুকের পূর্ব পুরুষ উচচ মর্যাদার অধিকারী ছিল না প্রভৃতি।

এমনিভাবে গ্রহ-নক্ষত্রাদির উত্থান বা পতনকে বৃষ্টির কারণ বা অসীলা মনে করা। অথচ তাদের অধিকাংশই এ বিশ্বাস রাখে না যে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির উত্থান বা পতনের মূল নিয়ামক খোদ আল্লাহ রাববুল আলামীন।

অতঃপর মৃত ব্যক্তির উপরে শোক করার বিষয়টি অনেকে শ্রেষ্ঠ আমল ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। যেমন- বিশেষ করে প্রতি বছর আশুরার সময় ইমাম হোসায়েনের রা. নামে 'তাযিয়া' বা শোক মিছিল বের করা হয়।

এমনিতরো অসংখ্য বেদআত চালু হয়ে গেছে যা লেখতে গেলে কলম ভারী হয়ে যাবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহর উপরেই ন্যস্ত। তিনি ব্যতীত কোনো শক্তি নেই।

৮৫। বাপ-মায়ের কর্ম দ্বারা কাউকে তিরস্কার করা

অন্যের কর্ম দ্বারা বিশেষ করে বাপ-মায়ের কর্ম দ্বারা মানুষকে তিরস্কার করা জাহেলী যুগের অন্যতম রীতি ছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রীতির বিরোধিতা করলেন। অবশ্য এই অপকর্মের ফলে কেউ মুশরিক বলে গণ্য হবে না।

সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের মধ্যে মারুর রা. হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন যে, আমি একদিন আবুযর গিফারী রা. এর সংগে রবযাহ নামক স্থানে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখি যে, তাঁর ক্রীতদাস ও

তিনি একই ধরণের পোষাক পরে আছেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, আমি একজন লোককে তার মায়ের নামে গালি দিয়েছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, হে আবুযর ! তুমি কি করে মায়ের নামে তিরস্কার করলে? তোমাদের অধীন যারা তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করেছেন। অতএব তোমাদের কারো অধীনে কোনো ভাই থাকলে সে যেন নিজে যা খায়, তাই তাকে খাওয়ায়, নিজে যে পোশাক পরে তাই তাকে পরায় ও তাদেরকে অধিক না খাটায়। যদি খাটাতে হয়, তাহলে তোমারা নিজেরা ওদেরকে সাহায্য করো। হাদীসটির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ বহু কথা বলেছেন। যা এখানে তা আলোচনা করা হলো না।

মোটকথা, এক জনের কর্মের কারণে অন্যকে তিরস্কার করা মোটেই পূর্ণ ঈমান ও দুরদর্শিতার পরিচায়ক নয়। আবুযর গিফারী রা. পূর্ণ ঈমান ও মারেফাত হাছিল করার পূর্বে এক সময় বিলালের রা. সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে তিনি বিলালকে রা. 'ইবনুস সওদা' বা কৃষ্ণমাতার সন্তান বলে গালি দেন। বিলাল রা. এ বিষয়ে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট অভিযোগ করলে তিনি আবুযর

গিফারীকে ডেকে বলেন যে, আবুযর তুমি কি বেলালকে গালি দিয়েছ? তুমি কি তাকে তার কৃষ্ণমাতার নামে ধিক্কার দিয়েছ? তিনি বলেন- জ্বী হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, আমার মনে হয় তোমার মধ্যে এখনও জাহেলী যুগের কিছু অংশ বাকী আছে। একথা শোনার সংগে সংগে আবুযর গিফারী রা. মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন এবং বলেন আমি আমার চেহারা মাটি থেকে উঠাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বেলাল তার পা দিয়ে আমার চেহারা মাড়িয়ে যাবে।'

হায় ! হায়! আজকের মানুষের মধ্যে জাহেলী যুগের এ সকল স্বভাব কত ব্যাপকহারেই না দেখা যাচ্ছে। তারা একটা দেশের একজন মানুষের অপকর্মের জন্য পুরা দেশবাসীকে তিরস্কার করেছে। জাহেলী স্বভাব থেকে এরা আর কত দূরে।

৮৬। কোনো বিশেষ ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার গর্ব

‘জাহেলী যুগের আরবরা কাবাগরের মুতাওয়াল্লী হওয়ার কারণে অহংকার করতো। আল্লাহ তাদের এই বদ স্বভাবের নিন্দা করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন-

حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ (سورة المؤمنون : ٦٤-٦٧)

‘আমি যখন তাদের নেতাদের গ্রেফতার করবো, তখন তারা আর্তনাদ করে উঠবে। তাদেরকে বলা হবে আজ আর্তনাদ করো না, তোমাদের কোনরূপ সাহায্য করা হবে না। আমার আয়াতগুলো তোমাদের নিকট যখন তিলাওয়াত করা হতো, তখন তোমরা (কাবা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার গর্বে) দম্ভবরে এ বিষয়ে আজে বাজে কথা বলতে বলতে পিছনে ফিরে চলে যেতে।’ (সূরা আল-মুমিনুন, ২৩: আয়াত ৬৪-৬৭)

মোটকথা, জাহেলী যুগের অন্যতম স্বভাব ছিল কোনো পবিত্র স্থানের উপর দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে অহংকার করা। আজকের যুগে

যেমন অনেকেই এসব কারণে মর্যাদার দাবী করে থাকে। মক্কা-মদীনার উপরে নেতৃত্ব থাকার কারণে কেউ নিজেদেরকে সারা মুসলিম বিশ্বের উপরে মর্যাদা দাবী করে। কেউবা কোনো পূন্যস্থান বা নেককার লোকদের বাসস্থানের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার কারণে সম্মানের দাবী করে।

যারা শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর রহ. দিকে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করেন, তারা তার কবরে তত্ত্বাবধানের গৌরবে নিজেদের জন্য কিছু মর্যাদা কামনা করেন। এর অন্যতম কারণ তারা এ সমস্ত নজর মানত এবং ছদকা কুরবানীসহ বিভিন্ন শিরকী উৎসর্গসমূহের তত্ত্বাবধান করে থাকে। যা হিন্দু, কুর্দী ও অন্যান্য মূর্খ মুসলিমরা সেখানে ভেট হিসাবে নিবেদন করে থাকে। এই সব কবরের তত্বাবধানকারী তথাকথিত খাদেম ও মুতাওয়াল্লীরা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচে নিকৃষ্ট, সর্বাপেক্ষা নীচ ও মতবাদের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

এদের এই মুতাওয়াল্লীগিরী বা পৌরিহিত্য আল্লাহর নিকট কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহর ক্রোধ ও অপরের হাত থেকে এদেরকে কেউই রেহাই দিতে পারবে না। যদিও লোকরা এদের (অলৌকিক

কেরামতি বা কামালিয়াতের নমুনা দেখে) অনেক কিছু উচ্চ কল্পনা করে থাকে। এরা আল্লাহ ও তার নেককার বান্দাদের নিকট ছোট পিঁপড়ার চেয়েও নিকৃষ্ট। কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর রহমত হতে এরা থাকবে বহু দূরে।

৮৭। নবী বংশের লোক হওয়ার গর্ব

ইয়াহূদী ও নাছারাগণ (ইব্রাহীম, ইয়াকুব তথা বনী ইস্রাইলের হাজার হাজার নবীর) বংশধর হওয়ার কারণে আত্মগর্বে গর্বিত ছিল। আল্লাহ রাববুল আলামীন তাদের এই হীন মানসিকতার প্রতিবাদ করে বলেন-

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (سورة البقرة : ١٣٤)

(নবীদের) সেই দল চলে গেছেন। তাদের আমল ছিল তাদের। তোমাদের আমল হবে তোমাদের। তোমাদেরকে তাঁদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ১৩৪)

অর্থাৎ শুধুমাত্র বংশীয় সম্পর্ক কোনো কাজ দেবে না। বরং পূর্ব পুরুষদের মত সৎকর্মশীল ও পূণ্যবান হতে পারলে তবেই কিছু ফায়দা হতে পারে। কেননা তাদের পাপের জন্য তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না, কিংবা তাদের পূন্যের ছওয়াবও তোমরা পাবে না।

একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বংশের লোকদের ডেকে বলেন- 'হে কুরাইশগণ। নবীদের নিকট সমস্ত লোকদের মধ্যে আপন তারাই যারা মুত্তাকী। তোমরা সেই পথের পথিক হও। দেখো, আমার কাছে কোনো লোক দুনিয়াদারী কাজকর্ম নিয়ে আসে না। অথচ তোমরা কেবল ঐ স্বার্থের কাছে এসে থাকো। ফলে আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই।

উক্ত আয়াতটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেরই সমর্থক-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (سورة الحجرات : ١٣)

'হে মানব জাতি! আমরা তোমাদের নারী ও পুরুষের সমবায়ে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদের বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, কেবল তোমাদের (পারস্পরিক সহজ) পরিচিতি লাভের জন্য।

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী মুত্তাকী বা পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ (তোমাদের) সব কিছু জানেন, খবর রাখেন। (সূরা আল-হুজরাত, ৪৯: আয়াত ১৩)

ইয়াহূদী-নাছারাদের যে স্বভাবের কথা উপরে বিধৃত হলো, উক্ত জাহেলী স্বভাব আজ বহু মুসলিমদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। যাদের একমাত্র পুঁজিই হলো, বাপ দাদার গর্ব। যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন আমি আব্দুল কাদের জিলানীর রহ. বংশধর। কেউ বলেন আমি আহমদ রিফাঈর আওলাদ।

কেউ বলেন আমি আবু বকরী, কেউ বা ওমরী, কেউবা আলুবী, কেউবা হাসানী, কেউবা হুসাইনী ইত্যাদি। অথচ কেয়ামতের মহাবিচারের দিনে এসব সম্পর্কে কোনো কাজ দিবে না। পরিত্রাণ পাবেন ঐদিন কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি সমর্পিত অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে হাযির হতে পারবেন।

বিস্মিত হতে হয় এসব লোকদের অবস্থা দেখে। যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ আদরের দুলালী

ফাতিমা রা. কে বলছেনঃ ‘হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা ! আল্লাহর দরবারে আমি তোমার কোনই উপকারে আসবো না।’ সেখানে এইসব বংশগর্বী লোকেরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে? অথচ বিভিন্ন অন্যায় কলা কৌশলের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ শোষণ করা ব্যতীত এদের অন্য কোনো যোগ্যতা নেই।[৩১]

কবির বলেনঃ

إن الفتى من يقول ها أنا ذا * ليس الفتى من يقول كان أبي

‘নিশ্চয়ই প্রকৃত যুবক সেই যে, বলে যে, আমি বা আমার পরিচয় এই। সে কখনোই সত্যিকারের যুবক নয়, যে বলে আমার পিতা অমুক ছিলেন। অন্য এক কবি বলেন-

أقول لمن غدا في كل يوم * يباهينا بأســـلاف عـــظام

أتقنع بالعظام وأنت تدري * بأن الكلب يقنع بالعظام.

---

[31] যাঁরা আমাদের দেশে আওলাদে রাসূলের নামে কিংবা আবু বকর ছিদ্দিকের বা আলীর বংশধর হওয়ার নামে গর্ববোধ করেন কিংবা ঐ বংশের লোক হওয়ার কারণে তাদের প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন, তাঁরা একবার আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করুন। (অনুবাদক)

আমার কাছে প্রতিদিন সকালে একব্যক্তি এসে বংশের প্রাক্তন লোকদের নিয়ে বড়াই করে। অবশেষে আমি তাকে একদিন বললাম, তুমি যে শুধু বংশের হাড়-গোড় নিয়ে গৌরব করো, অথচ তুমি তা ভাল করেই জানো যে, কুকুরই শুধু হাড়-গোড় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে'।

৮৮। পেশার অহংকার

পেশার কারণে একে অপরকে ঘৃণা ও গর্ববোধ করা জাহেলী যুগের অন্যতম রীতি ছিল। যেমন- কুরাইশ বংশের লোকেরা ব্যবসায়ী ছিল। তারা শীত মওসুমে (অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এলাকায়) ইয়ামনে এবং গ্রীষ্ম মওসূমে (তুলনামূলক ঠান্ডা এলাকা) সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো। যে কথা সূরা কুরাইশের মধ্যে বিধৃত হয়েছে। (ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তারা স্বাস্থ্য ও সম্পদশালী) সে কারণে- কৃষিকর্মে নিয়োজিত চাষীদের উপরে অহংকার প্রদর্শন করতো (যেমন আমাদের দেশে শেখ, সৈয়দ, খান ও চৌধুরী সাহেবরা চাষী ও কারিগর সম্প্রদায়ের ভাইদেরকে 'চাষা' ও জোলা'

বলে টিটকারী করে থাকে)। অথচ এ বিষয়ে আল্লাহ পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করে বলেন-[৩২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ (سورة الحجرات : ١١)

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়ের লোককে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে। কোনো মহিলাও যেন কোনো মহিলাকে বিদ্রুপ না করে'। (সূরা আল-হুজরাত, ৪৯: আয়াত ১১)

মোটকথা, কোনো পেশাদার ব্যক্তি যেমন অন্য কোনো পেশার ব্যক্তিকে শুধু পেশাগত কারণে টিটকারী না করে। কেননা দুনিয়াবী যে কোনো হালাল পেশার উদ্দেশ্য হলো তদ্বারা আল্লাহর আদেশ নিষেধের আনুগত্য করা এবং পরিশেষে (জান্নাতের চিরস্থায়ী মুক্তি ও শান্তি অর্জন করা। আর যাবতীয় পর্বের মূল হলো সেখানে। তা ব্যতীত বাদবাকী সবকিছু অপসৃয়মান ছায়ার ন্যায়।

অতএব কোনো প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য পার্থিব জীবনের চাকচিক্য নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। যে কোনো মুহূর্তে এসব ছেড়ে চলে যেতে

হবে। (আসুন) আল্লাহর নিকটে আমরা সেইসব সৎকর্ম সম্পাদনের শক্তি কামনা করি, যা করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। (আমিন)

৮৯। দুনিয়ার ঐশ্বর্যকে বড় করে দেখা (ধন সম্পদের অহংকার)

এটাও জাহেলী যুগের একটা রীতি। শেষ নবীর বিরুদ্ধে আরবদের এক যুক্তি ছিল যে,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ (سورة الزخرف : ٣١-٣٢)

‘এই কুরআন কেন (মক্কা ও তায়েফের) দুই প্রধান জনপদের কোনো ব্যক্তির উপর নাযিল হলো না? তারা কি আপনার প্রভুর রহমত (অর্থাৎ পবিত্র কুরআন) (নিজেদের ইচ্ছামত) বন্টন করে নিতে চায়? আমরাই তাদের জীবন-জিন্দেগীতে তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করে থাকি এবং একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, যাতে তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে। তারা যেসব ধন-সম্পদ

জমা করেছে, তার চাইতে আপনার প্রভুর দেওয়া রহমত (নবুওত ও অন্যান্য যে সব বস্তু ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য আনয়ন করে) অনেক উত্তম'। (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: আয়াত ৩১-৩২)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে দুই প্রধান জনপদের মধ্যে মক্কার ছিলেন ওলিদ ইবন মুগীরা আল মাখযুমী এবং তায়েফে ছিলেন হাবীব ইবন উমর ইবন উমায়ের আছ-ছাক্কাফী। দু'জনেই ছিলেন প্রভুত মান-সম্মান ও ধন সম্পদের অধিকারী। অলীদ ইবন মুগীরা- যাকে কুরাইশের "থোকা ফুল বা রায়হানাতু কুরাইশ বলা হতো- তিনি বলতেন, যদি মুহাম্মাদের কথাই সব সত্যি হতো, তাহলে তা (অর্থাৎ কুরআন) আমার উপর নাযিল হতো অথবা আবু মাসউদের উপর।

মোটকথা, ধন-সম্পদ সঞ্চয় কোনো প্রকৃত সঞ্চয় নয়, বরং নশ্বর দুনিয়ার সঞ্চয়ের চেয়ে আখিরাতের সঞ্চয়ই বড় সঞ্চয়। অথচ প্রিয় পাঠক! তুমি দেখবে আমাদের সমাজে বহু লোকের মধ্যে ব্যাপকহারে ঢুকে পড়েছে। তুমি দেখতে পাবে যে, একজন তিনি যত বড় বিদ্বান হোন না কেন, যদি তিনি দরিদ্র হন, তাহলে লোকেরা তাকে কোনই মূল্য দিবে না। বরং তার ধনী লোকের দিকে তাকিয়ে থাকবে ও

তাদের কথার মূল্য দিবে। এ জন্যেই তো রাসূলুল্লাহ এর কবি হাসসান ইবন ছাবিত রা. কবিতা রচনা করেন- যার অর্থ নিম্নরূপ :

‘দরিদ্রতা বহু জ্ঞানী-ধৈর্য্যশীলকে ধ্বংস করেছে। পক্ষান্তরে বহু মূর্খ লোক স্বচ্ছলতার মধ্যে ডুবে আছে।’

৯০। দরিদ্রদের ঘৃণা করা

ইমাম আহমদ ও তাবরানী প্রমুখ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন যে, একদল কুরাইশ রাসূলে করীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার নিকটে সুহাইব, আম্মার, খাববাব ও অনুরূপ দুর্বল মুসলিমরা বসেছিলেন। কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে মুহাম্মদ, তুমি এইসব লোক নিয়ে সন্তুষ্ট? আল্লাহ কি আমাদের মধ্যে কেবল এই লোকগুলির উপরে মেহেরবাণী করলেন? আমরা কিভাবে এদেরই নীচে থাকবো? ওদেরকে তোমার ওখান থেকে বের করে দাও। তাহলে হয়তবা আমরা তোমার অনুসরণ করতে পারি।

ইবনে জারীর আবু শায়খ, বায়হাকী, দালায়েল প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে খাব্বাব রা. হতে বর্ণনা করেন যে, আকরা' ইবন হাবিস তামীমী, 'উয়াইনা ইবন হিসন ফাযারী আল্লাহর নবীর দরবারে বলেন, আমরা চাই, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি আমাদের সংগে পৃথক মজলিসে বসো। বিভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের সম্মুখে আমরা আমাদের ঐসব কৃতদাসদের সংগে একত্রে বসতে লজ্জাবোধ করি। এসো, আমরা এই মর্মে একটা লিখিত চুক্তি করি যে, যখন আমরা আসবো, তখন তুমি ওদেরকে উঠিয়ে দেবে। তারপর যখন আমরা চলে যাবো, তখন তুমি চাইলে ওদেরকে নিয়ে বসতে পারো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সম্মত হলেন এবং আলীকে চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করার জন্য কাগজ কলম নিয়ে আসতে বলেন। এমতাবস্থায় আমরা সবাই এই কোণে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ . (سورة الأنعام : ٥٢)

‘যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করবে না। তাদের কর্মের জওয়াবদিহির দায়িত্ব তোমার নয়, বা তোমার কর্মের জওয়াবদিহিতার দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। যদি তা করো, তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা আল-আন‘আম, ৬: আয়াত ৫২)

অতঃপর তিনি আমাদের কাছে ডাকলেন এবং পরবর্তী আয়াতটিও শুনিয়ে দিলেন-

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (سورة الأنعام : ٥٤)

‘যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা.তোমার নিকট এলে তাদেরকে বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক- তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে নিজের উপর অবশ্যকরণীয় নির্ধারণ করে নিয়েছেন। তোমদের মধ্যে অজ্ঞতাবশতঃ কেউ কোনো মন্দকার্য করার পর যদি তাওবা ও সংশোধনে ব্রতী হয়, তবে আল্লাহতো মহা

ক্ষমাশীল ও পরম কৃপানিধান।’ (সূরা আল-আনআম, ৬: আয়াত ৫৪)।

এরপর থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে নিয়মিত বসতাম এবং তিনি যখন চাইতেন আমাদেরকে ছেড়ে যেতেন। (এতটুকুও আল্লাহ সহ্য করলেন না) ফলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ (سورة الكهف : ٢٨-٢٩)

‘তুমি নিজেকে ঐসব লোকদের সংগে ধরে রাখ, যারা তাদের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে। তুমি পার্থিব সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে না এবং যার অন্তঃকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে

দিয়েছি, যে, ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীমত কাজ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে- তুমি তার আনুগত্য করবে না। তুমি বলে দাও যে, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। যে চায় তা বিশ্বাস করুক, যে চায় তা প্রত্যাখ্যান করুক। তবে আমরা সীমা লংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম'। (সূরা আল-কাহাফ, ১৮: আয়াত ২৮-২৯)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা মজলিস থেকে উঠে গেলে সবশেষে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়াতেন।'[৩৩]

সূরা আল-আন'আমের ৫২ আয়াতের অংশ 'তাদের কর্মের জওয়াবদিহিতার দায়িত্ব তোমার নয়'- এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, তুমি তাদের গোপন আমলসমূহের সন্ধানে মনোযোগী হবে না। তা রিসালাতের মর্যাদা বিরোধী। তুমি তাদের প্রকাশ্য আমলগুলো দেখে তার উপর ভিত্তি করে নির্দেশ দিবে। গোপন আমলসমূহের বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। এখানে ঐসব দরিদ্র ও

---

[33] মাননীয় গ্রন্থকার একই মর্মে ইবনুল মুনযির হতে আরেকটি দীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা করেছেন। যা বাদ দেওয়া হলো। (অনুবাদক)

দূর্বল মুসলিমদের বাহ্যক আমল এই যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে। ইবনে যায়েদ উক্ত আয়াত অংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর তাৎপর্য হবে এই যে 'তাদের রুজী-রুটি বা দরিদ্রতার জওয়াবদিহী আপনাকে করতে হবে না।'

৯১। ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব, রিসালাত ও কেয়ামতকে অস্বীকার করা

তাফসীর, হাদীছ ও আক্বায়েদের কিতাবসমূহে জাহেলী আরবদের উপরোক্ত অস্বীকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এখানে এর পক্ষে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো। যেমন আল্লাহ বলেন-

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . (سورة التغابن : ٧)

'অবিশ্বাসীরা ধারণা করছে যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত হতে হবে না। তুমি বলে দাও যে, হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ) তোমাদেরকে সকলকে অবশ্য অবশ্যই উঠানো হবে। অতঃপর অবশ্যই

তোমাদেরকে তোমাদের (সারা জীবনের) কাজকর্ম সম্পর্কে খবর দেওয়া হবে। আর এ বিষয়টি আল্লাহর জন্য অতীব সহজ। (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত ৭)

জাহেলী আরবদের রচিত বহু কবিতায় তাদের এই অস্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-জনৈক কবি বলেছেন-

....

يحدثنا الرسول بأنا سنحيا * وكيف حياة أصداء وهام.

'এই রাসূল আমাদেরকে বলেন যে, আমরা পুনরায় জীবিত হবো। কিন্তু কেমন করে জং ও মাথার মরা খুপরীর মধ্যে জীবন আসতে পারে?'

আর এক কবি বলেন-

حياة ثم موت ثم نشر * حديث خرافة يا أم عمرو.

'জীবন, ফের মরণ, আবার পূনরুত্থান। হে আমরের মা, এসবই বাজে কথা।'

অন্যত্র আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন যে, তারা বলত,

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾.
(سورة الصافات : ١٦-١٧)

"আমরা মরে গিয়ে হাড্ডি-মাটি সার হবো। তারপরও আমাদের বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ সবাই পূনরায় জীবন্ত উঠবো।' (সূরা আছ-ছাফফাত, ৩৭: আয়াত ১৬-১৭)

বিষয়টির উপরে আমরা অত্র গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছি।

৯২। জিবত ও তাগুতের উপর ঈমান

জাহেলী যুগের লোকেরা জিবত (প্রতিমা, জাদুকর) ও তাগুতের (আল্লাহবিরোধী শক্তির) উপর ঈমান রাখতো এবং মুশরিকদের দ্বীনকে মুসলিমদের পবিত্র দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিত।

যেমন আল্লাহ বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (سورة النساء : ٥١)

'আপনি কি দেখেননি কিতাবধারী (ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের) দেরকে, যারা জিবত ও তাগুতের উপর ঈমান এনেছে এবং অবিশ্বাসীদেরকে বলছে যে, তোমরা ঈমানদারদের চেয়ে অনেক হেদায়াতপ্রাপ্ত'। (সূরা আন-নিসা, ৪: আয়াত ৫১)

বিষয়টি ইতোপূর্বে (৫০ নং মাসআলায়) আলোচিত হয়েছে।

পুনরায় এখানে অবতারণার উদ্দেশ্য হলো যে, মূর্খ ইয়াহূদী খৃষ্টানরা মুশরিকদেরকে বলতো যে, মুসলিমদের চেয়ে তোমরা অনেক হিদায়েত প্রাপ্ত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সংগী-সাথীদের নিকটে যা আছে, তোমাদের নিকট তার চেয়ে উত্তম বস্তু রয়েছে।

প্রিয় পাঠক! আপনি দেখতে পাবেন আজকের যুগের সুফী সাহেবরা ঐসব মুশরিকদের মত বলে থাকেন যে, 'কবরবাসী মৃতব্যক্তির (পীরের) নিকট প্রার্থনা নিবেদনকারীগণ, তাওহীদ ও সুন্নাতের পাবন্দ

ঐসব মূ’মিনদের চেয়ে অনেক উত্তম, যারা লোকদের কবর পূজা হতে নিষেধ করে থাকেন।

৯৩। জানা সত্ত্বেও সত্য গোপন

যেমন ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের আলেম বা পাদ্রী পুরোহিতদের সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বর্ণনা করেছেন। [৭৪ নং মাসআলা দৃষ্টব্য।]

যেমন তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কিত তাওরাত ও ইঞ্জীলের ভাষ্যসমূহ গোপন করেছে। অথচ তারা এগুলো তাদের গ্রন্থে আসার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ প্রণীত আল-জাওয়াবুস সহীহ নামক গ্রন্থে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[34]

৯৪। না জেনেশুনে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা

---

[34] ৩/৩২২-৩৬৮।

এটিই সব বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির মূল উৎস। এ জাহেলী স্বভাবটি বেশী করে ঢুকে পড়েছে বেদআতী কালাম শাস্ত্রবিদ (মুসলিম) দার্শনিকদের মধ্যে। তারা আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে এমন সব কথা বলছেন, যে সম্পর্কে আল্লাহ কোনো দলীল নাযিল করেন নি। তারা শরীয়তের নীতি নির্দেশসমূহকে নিজেদের খেয়াল খুশীমত ব্যাখ্যা করেছে। যেমন প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম রাযী করেছেন তার 'আসাসুত তাকদীস' নামক গ্রন্থে। আল্লাহ শায়খুল ইসলাম **ইবন তাইমিয়্যাহকে** উপযুক্ত প্রতিদান দিন, তিনি এর যথার্থ প্রতিবাদ করেছেন, ভিত্তি গুড়িয়ে দিয়েছেন, ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা দূরে নিক্ষেপ করেছেন ও নিঃশ্বাস সংকীর্ণ করে দিয়েছেন।[35] এজন্যেই তো আল্লাহ বলেন-

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ . (سورة البقرة : ٢٥١)

[35] সেটা তার কালজয়ী "বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ" গ্রন্থে। যার অন্য নাম হচ্ছে, 'নাকদু তা'সীসিল জাহমিয়্যাহ।

‘যদি আল্লাহ একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন, তাহলে এ পৃথিবী বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হয়ে যেত। (সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: আয়াত ২৫১)

৯৫। স্ববিরোধিতা

এটাও ছিল জাহেলী যুগের একটি স্বভাব। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (سورة ق : ٥)

বরং ওরা প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যখন তা তাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। আসলে ওরা সিদ্ধান্তহীনতার মাঝে বিরাজ করছে। (সূরা ক্বাফ, ৫০: আয়াত ৫)

আজকাল যারা বেদআতী, তাদের অবস্থা হয়েছে ঠিক অনুরূপ। এরা ইসলামের দাবী করে। অথচ এমন সব কার্য করে, যা ইসলামের বিরোধী।

৯৬। পাখী উড়িয়ে ভালোমন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

৯৭। আঁক-জোক করে ভবিষ্যত বের করার দাবি করা।

৯৮। কোনো কিছুকে অশুভ ধারণা করা

যেমন- কোনো তারকা বা পাখীর ডাক কিংবা কোনো ব্যক্তিকে অশুভ মনে করা ইত্যাদি।

৯৯। গণকবাজি বা তার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা

১০০। তাগুতের নিকট বিচার-ফয়সালা চাওয়া ও গ্রহণ করা। ইত্যাদি

তাগুত বা ইসলাম বিরোধী যে কোনো শক্তির নিকট বিচার-ফয়সালা চাওয়া ও তাদের বিচার ফয়সালা মেনে নেওয়া।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা আমাদের ‘বুলুগুল আরব ফী আহওয়ালিল আরব’ নামক কিতাবে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা ঐসব লোকদের সমস্ত জাল-জুয়াচুরি ও বিভ্রান্তিসমূহ উন্মোচিত করেছি। আজকের যুগের বহু মূর্খ মুসলিম এসবের শিকার হয়েছে। “অথচ তারা ভাবছে যে, তারা খুব পূণ্যের কাজই করছে।” [সূরা আল-কাহাফ: ১০৪]

আসল বইয়ের মাসআলাগুলো ‘ইকতিজাউস সিরাতিল মুস্তাকীম’ নামক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পাঠক ইচ্ছা করলে সেটা পড়ে দেখতে পারেন।[৩৬]

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সমস্ত দরুদ ও সালাম সৃষ্টির সেরা মানুষ, অন্ধকারের জ্যোতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবায়ে কেরাম ও যুগ যুগ ধরে তাদের অনুসারীগণের উপর বর্ষিত হোক।

সমাপ্ত

[36] প্রকাশ থাকে যে, মূল বইয়ের উপর ইরাকের সৈয়দ মাহমূদ শুকরী আলুসীকৃত ভাষ্যসহ অত্র পুস্তক অনূদিত হয়েছে।